দুই পথিক

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

'বনফুল'

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

উৎসর্গ

শ্রীমুরারীমোহন বাগচি

প্রীতিভাজনেষু

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশে তুমুল মেঘ, ঝড় আসন্ন। গোবর্ধনবাবু পারঘাটায় এসে পৌঁছলেন পারের আশায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আশা অবশ্য হতাশায় পরিণত হল। এও তিনি অনুভব করলেন পিতৃবাক্য অমান্য করে অন্যায় করেছেন। যখন জেনেছিলেন আজ ত্র্যহস্পর্শ তখন তাঁর আসা উচিত হয় নি। পারঘাটার ঘরটির দিকে তাকালেন তিনি। তাকিয়ে কোনও আশ্বাস পেলেন না। পারঘাটায় যাত্রীদের জন্য যে ঘরটি আছে সেটি একটি অদ্ভুত সমন্বয়। একটা দেওয়াল পাকা, সাবেক আমলের চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথা। বাকি তিনটে দেওয়াল কাঁচা, মাটি-দিয়ে তৈরি। মাথার উপর যে চালাটা আছে সেটাও অদ্ভুত। সেটার খানিকটা খড়, খড়ের উপর খাপরাও আছে কিছু, আর খানিকটা টিন। একটু হাওয়া হলেই খড় খড় শব্দ হয়। গোবর্ধনবাবু দেখলেন পারঘাটায় যাত্রীদের কাছে পয়সা নেবার জন্য যে ট্যারা লোকটি এখানে সাধারণত থাকে সে-ও অনুপস্থিত। বস্তুত, কেউ নেই আশে পাশে। থমথম করছে চতুর্দিক। গঙ্গাও যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কিসের প্রত্যাশায়। তারপরই শোঁ শোঁ করে শব্দ হল। ঝড় এসে গেল। খড় খড় করে উঠল টিনটা। গোবর্ধনবাবু দৌড়ে ঘরটায় গিয়ে প্রবেশ করলেন।

"দাঁড়ান দাঁড়ান মশাই, পা-টা মাড়িয়ে দেবেন না।"

চমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন গোবর্ধনবাবু।

"টর্চ আছে আপনার পকেটে?"

"না।"

"আমার কাছেও নেই। অথচ বাড়িতে ফুল্‌লি লোডেড ভালো টর্চ আছে একটা। আসবার সময় আনতে ভুলে গেলাম। আমি তো সব জিনিসই ভুলি, আমার গিন্নিও ভুলে গেলেন, মেয়েটাও ভুলে গেল। দাঁড়ান, আমি একটু সরে যাচ্ছি ঘেঁষটে ঘেঁষটে। আপনি একটু বাঁ-দিকে ঘেঁষে আসুন। ঘাটের কাছে এই গর্তটায় পড়ে গিয়ে পা-টি বেশ মচ্‌কেছি, বেশ জমাটি রকম মচ্‌কেছি। একটু বাঁ-দিক ঘেঁষে এসে ওই বাঁ দিকের কোণটাতেই বসে পড়ুন। যা গতিক দেখছি আজ সমস্ত রাত্রিই এখানে অবস্থান করতে হবে। নৌকা আজ আর আসছে না, এলেও তাতে চড়া নিরাপদ নয়। যাক্, তবু একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। আসুন, আসছেন?"

"আসছি, বাঁ-দিক ঘেঁষেই আসছি।"

খুব সন্তর্পণে গিয়ে বাঁ কোণটাতে বসে পড়লেন গোবর্ধন।

"আপনিও কি ওপারের যাত্রী না কি?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে আসুন আজ এইখানেই দুজনে মিলে রাত্রিবাস করা যাক। আজকালকার ভাষায় যাকে বলে সহ-অবস্থান। ভালই হল, কথা কয়ে সময়টা কাটবে, অবশ্য ঘরটা যদি হুড়মুড় করে মাথার উপর না পড়ে—"

"যদি পড়েও উপায় কি, মাথা পেতে নিতে হবে। বাইরের অবস্থা বেশ ঘোরালো—"

"এবং জোরালো। ওই কোণের দিকে খড় আছে, ভাল করে গুছিয়ে বসুন যতক্ষণ পারেন।"

"বসছি। দাঁড়ান কুকুরটাকে ডেকে আনি।"

"কুকুর? কুকুর আছে নাকি সঙ্গে আপনার?"

"সঙ্গে ছিল না, রাস্তায় জুটে গেল। নেড়ি কুকুর। ভাব হয়ে গেছে। দেখি, কোথা গেল।"

"ঘরের তো এই অবস্থা এর ভেতর কুকুর ঢোকাবেন? ভেবে দেখুন।"

"আমি ঢোকাতে চাইলেই ঢুকবে কি? ওরা মনমর্জি প্রাণী। বাইরে দাঁড়িয়ে বা কোনও আস্তাকুঁড়ের ছাইগাদায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঠকঠক করে কাঁপবে তবু ভিতরে আসবে না। তবু দেখি কোথা গেল।"

বেরিয়ে গেলেন গোবর্ধনবাবু।

খানিকক্ষণ পরেই ফিরে এসে বললেন, "এল না। ভজুয়ার বউটাব সঙ্গে ভাব জমিয়েছে।"

"ভজুয়া আবার কে?"

"ট্যারা ভজুয়াকে চেনেন না? এখানে প্রথম এসেছেন বুঝি! ভজুয়াই তো এখানকার মালিক। পারাণির পয়সা নেয়, ট্যাক্স কলেক্টার।"

"আমি যখন এলাম তখন তো সে ছিল না!"

"মদটদ আনতে গেছে বোধহয়। বউটা তো চাট্ তৈরি করছে দেখলাম।"

"আমাদের জন্যে কিছু খাবার তৈরি করে দেয় না। পয়সা দেব "

"পয়সা দিলে দেবে না। এমনি যদি দেয়। বলে তো এলাম। মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে বললে দেব। দেবে কি না ভগবানই জানেন। ওদেরই আজকাল রাজত্ব, বুঝলেন—"

"রাজত্ব মানে?"

"মানে, কারও পরোয়া করে না। মানুষেরও নয়, প্রকৃতিরও নয়। স্বামী স্ত্রী দুজনেই গতর খাটিয়ে খায়। ঝড় বৃষ্টিতে আমরা বেকায়দায় পড়েছি, ওদের গ্রাহ্য নেই। স্বামীটা মদ আনতে গেছে, স্ত্রী চাট্ তৈরি করছে। আমরা কি ও রকম পারি?"

"রাম কহ। তবে আমরা যা পারি তা আবার ওরা পারে না। বসুন, বসুন, আপনার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ হবে মনে হচ্ছে। অদৃষ্টে যদি থাকে ভজুয়ার বউ সদয় হবে। হয় তো চর্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় সবই জুটে যাবে শেষকালে। অদৃষ্টের খেল তো আগে থাকতে বোঝবার উপায় নেই। ভজুয়ার বউয়ের কানে একটা কথা তুলে দিলে হয় তো কাজ হত।"

"কি কথা?"

"একজন সাধুবাবা এখানে আছেন। অন্ধকার বলে দেখতে পাচ্ছেন না, আমার আপাদমস্তক সব গেরুয়া।"

"ও, তাই নাকি। আমার প্রণাম নিন। গেরুয়ার উপর আমার খুব ভক্তি।"

"শুধু আপনার কেন, অনেকেরই। আমি গেরুয়ার উপযুক্ত হতে পেরেছি কি না জানি না—খুব সম্ভবত পারি নি—কিন্তু ওরই জোরে বেশ চালিয়ে যাচ্ছি। এ দেশে গেরুয়াধারীরা অনেকেই বেশ বড়লোক, অনাহারে তো কেউ মরেই না। ভক্ত জুটে যাবেই। ওই ভজুয়ার বউ যদি শোনে একজন সাধুবাবা এখানে বসে আছে, খাবার নিয়ে আসবে ঠিক। অন্তত ফলও আনবে দু'একটা। এ এক অদ্ভুত দেশ।"

গোবর্ধনবাবু সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের লোক?"

"আরে না মশাই। আমি এই সেদিন পর্যন্ত পুলিশে চাকরি করেছি। আমার জীবন-কাহিনী বিচিত্র। আপনার নামটি কি?"

"আমার নাম গোবর্ধন। গোবরও বলতে পারেন, ষাঁড়ের গোবর", বলেই হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি।

"বাড়ি কোথা? বিহারেই?"

"আজ্ঞে না। বাংলা দেশে। তা না হলে এমন দুর্দশা হয়। কোলকাতায় আমার কাজ ছিল কি জানেন? ফাটা একটা পেয়ালায়

পানসে চা খেয়ে বেরিয়ে যেতাম সকাল বেলা। তারপর সারাদিন চক্কোর মারতাম, যদি কোথাও কিছু লেগে যায়। অনেক জায়গায় লাগব-লাগবও হয়েছিল। কিন্তু লাগল না। ভায়ারা শত্রুতা করলেন। বাঙালীর সবচেয়ে বড় শত্রু কে জানেন ? বাঙালী।"

"বিহারে কেন এসেছেন ?"

"ওই চাকরির চেষ্টায়। ওপারে বিটলা গ্রামে সৌদামিনী দেবী বলে কে আছেন, তিনি যদি একটা চিঠি লিখে দেন, একজন উপমন্ত্রী তাহলে নাকি আমার উপর কৃপাদৃষ্টি করবেন। করবেন, মানে করতে পারেন। নদীর ওপারে বিটলা গ্রাম। ও গ্রামের উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু এখানে এসে দেখছি নৌকো নেই, নৌকোর আশাও নেই। যে রকম ঝড় বৃষ্টি নেবেছে তাতে এখন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে বাঁচি।"

"কোথা থেকে আসছেন আপনি ?"

"সাহেবগঞ্জ থেকে। সেখানে আমার এক আত্মীয় রেলে চাকরি করেন, তিনিই খবরটা দিলেন। আর সেখানে বটুদা নামে এক পরো-পকারী শিক্ষক আছেন তাঁর কাছ থেকে চিঠিও যোগাড় করে দিলেন একটা। এককালে সৌদামিনী দেবী নাকি বটুদার ছাত্রী ছিলেন।"

গেরুয়াধারী চুপ করে রইল।

তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন—ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ। হঠাৎ টিকটিকি ডেকে উঠলে যেমন শোনায় তেমনি শোনাল। কয়েক মুহূর্ত উসখুস করে গোবর্ধনবাবু বললেন, "ভজুয়ার বউয়ের কানে তুলে দিয়ে আসব নাকি কথাটা। ঠিকই বলেছেন সাধু সন্ন্যাসীদের উপর ওদের অগাধ ভক্তি।"

"কুকুর খুঁজতে গিয়ে এই তো খানিকটা ভিজে এলেন। আবার যাবেন ?"

"তাতে কি হয়েছে। বৃষ্টিতে আমার কিছু হয় না।"

আবার উঠে বেরিয়ে গেলেন গোবর্ধনবাবু। ফিরতে প্রায় আধঘণ্টা খানেক দেরি হল। গেরুয়াধারী মচকানো পায়ে হাত বুলুতে বুলুতে নিবিষ্ট চিত্তে বাইরে ঝড়ের আওয়াজ শুনছিলেন। তাঁর মনে হল ঝড়ের বেগটা যেন কমছে। গোবর্ধনবাবু ফিরলেন।

"ঝড়টা কমল। কিন্তু বৃষ্টিটা চেপে এল।"

"কি বললে ভজুয়ার বউ ?"

"কিছু বললো না, ঘাড়টি তুলে মুচকি হাসল একটু। আর এইটে করে দিলে—। এইটের জন্যই দেরি হল একটু।"

গোবর্ধন কোঁচার টেপ দিয়ে একটা বাটি ধরে এনেছিলেন, অন্ধকারে গেরুয়াধারী দেখতে পাচ্ছিলেন না।

"কি করে দিলে ?"

"এই চুনে-হলুদটা। ভজুয়ার টর্চটাও এনেছি। দাঁড়ান লাগিয়ে দিচ্ছি ভাল করে।"

টর্চ জ্বেলে অবাক হয়ে গেলেন গোবর্ধনবাবু। দিব্যকান্তি গৈরিক-ধারী কে এই মহাপুরুষ। টকটক করছে গায়ের রং, বড় বড় প্রদীপ্ত চোখ, কুচকুচ করছে চোখের কালো তারা।

"চুনে-হলুদটা এনে ভালই করেছেন। ধন্যবাদ আপনাকে। দিন, লাগিয়ে দিই।"

"আমিই লাগিয়ে দিচ্ছি, কোন্ পা-টা ? আপনার মতো একজন সন্ন্যাসীর পদ-সেবা করতে পাওয়া তো পরম সৌভাগ্য।"

"ভুল করবেন না। আমি সন্ন্যাসী নই। সন্ন্যাসী হবার চেষ্টা করছি। রিহার্সাল দিচ্ছি। আচ্ছা করুন পদসেবা, আমি ঠিক লাগাতেও পারব না।"

এই বলে একটা পা তিনি বাড়িয়ে দিলেন।

"এই পা-টায়। গোড়ালিটার একটু ওপরে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইখানে" গোবর্ধন সসম্ভ্রমে গেরুয়াধারীর পায়ে চুনে-হলুদ লাগাতে লাগলেন।

গেরুয়াধারী বললেন, "অন্ধকারে আপনার কথা শুনে এবং কাজকর্মে উৎসাহ দেখে মনে হয়েছিল আপনার কম বয়স। কিন্তু আপনার চুলে পাক ধরেছে দেখছি, অনেকের অবশ্য কম বয়সেই চুলে পাক ধরে—"

"না, না, তা নয়। মেঘে মেঘে আমার বেশ বয়স হয়েছে, পঞ্চাশের কাছাকাছি। গত জুনে আটচল্লিশ পার হয়েছি।"

"এ বয়সে তো লোকে রিটায়ার করবার কথা ভাবে। আপনি এখনও চাকরি খুঁজছেন? আশ্চর্য তো। চাকরি করেছিলেন এর আগে?"

"কতবার। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিডি কি জানেন? আমার বাবা। তাঁর জন্যেই আমার কিছু হ'ল না। জীবনে প্রথম চাকরি পেয়েছিলাম একটা বইয়ের দোকানে—"

গেরুয়াধারী বললেন, "আমারও তাই—"

"ও তাই নাকি! গ্রেট মেন থিংক্ অ্যালাইক শুনেছিলাম, কিন্তু এ যে গ্রেট মেন বিগিন অ্যালাইক দেখছি।"

আবার সেই ঘর-কাঁপানো হাসি।

"আপনার বাবার কথা কি বলছিলেন?"

"আমার বাবা এক অদ্ভুত লোক। এককালে জমিদার ছিলেন, মেজাজও সেই রকম। কিন্তু দেশ হয়ে গেল স্বাধীন এবং নেতাদের ভাগবাটোয়ারায় আমাদের জমিদারিটি পড়ে গেল পাকিস্তানে।—ভাগাভাগি হবার আগেই বাবা ভাগ্যে কোলকাতায় একটা আস্তানা করেছিলেন তাই কোনরকমে সেখানে মাথা গুঁজে আছি—"

"আপনার ভাই বোন—"

"কেউ নেই। একশ্চন্দ্রো তমো হন্তি। আমিই একমাত্র বংশধর। আর সেইটেই হয়েছে ট্র্যাজিডি। বাবা কিছুতেই ভুলতে পারেন না যে আমি জমিদারের বংশধর। তাই চাকরি পেলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

জিগ্যেস করেন, কি করতে হয়, ওদের ব্যবহার কেমন, মালিক ভদ্রলোক কি না, যদি কোথাও একটু খুঁত বেরুল, ব্যস্ আর রক্ষে নেই। ছেড়ে দাও ও চাকরি। এ ভাবে যে কত চাকরি গেছে তা আর কি বলব আপনাকে। অথচ বাড়িতে আমার কি কাজ জানেন? বাবার তামাক সাজা। ওরে গোবরা তামাক দে, ওরে গোবরা আর এক ছিলিম সাজ—হরদম লেগেই আছে। সারি সারি বারো চোদ্দটি কলকে সেজে রাখি আর যখন দরকার হয় টিকেটি ধরিয়ে দিই। শুধু কি টিকে ধরিয়েই নিস্তার আছে, ফুঁ দিতে হবে যতক্ষণ না ধরছে। বেশ করে ধরিয়ে গড়গড়ার উপর কলকেটি বসিয়ে নলটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলতে হবে, নিন টানুন। তিনি তখন চোখ বুজে ভড়াক ভড়াক করে টানবেন। রাত্রেও নিস্তার নেই। গোবরা ঘুমিয়েচিস নাকি? একটা কলকে ধরিয়ে দে তো বাবা। রোজ এই ব্যাপার। আমার হাতের তামাক সাজা না হলে বাবার কিছুতেই পছন্দ হয় না। বউকে তামাক-সাজা শেখালুম। লুকিয়ে বউয়ের সাজা কলকে দু'একটা দিলুম ধরিয়ে। কিন্তু একটান দিয়েই ভুরু কুঁচকে গেল বাবার। কে সেজেছে? এটা সুবিধে হয় নি তো! বুঝুন, এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত বাবার তামাক সাজতে হচ্ছে। আসলে এই তামাক-সাজার জন্যে সম্ভবত আমাকে উনি কাছছাড়া করতে চান না। যেই একটি চাকরি যোগাড় করি, অমনি জেরা শুরু হয়। তোমার মালিক কি জাত? সোনার বেণে? ব্রাহ্মণের ছেলে সোনার বেণের অধীনে চাকরি করবে কি! ছেড়ে দাও। ছেড়ে দিতে হয়। ছেড়ে দিয়ে আবার এসে তামাক সাজা। এই চলেছে সারাজীবন। কিছু রেস্ত ছিল এতদিন, তাই ভাঙিয়ে চলছিল, আর কিছু নেই তাই বেরিয়ে পড়েছি বাড়ি থেকে। এখন ওই সৌদামিনী দেবী যদি দয়া করেন—"

"আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি?"

"তা মা ষষ্ঠী কৃপা করেছেন। চারটি মেয়ে, চারটি ছেলে। বড় মেয়েটির বয়স কুড়ি, বড় ছেলেটির বয়স পনরো। কি যে অকূল পাথারে পড়েছি দাদা তা আর আপনাকে কি বলব—"

"হ্যাঁ, বুঝতেই পারছি। আমার এই গেরুয়া চাদরটাই নিন্, এক-ধারটা ছিঁড়ে ফেলুন, ইতস্তত করবেন না, পুরোনো চাদর। এইবার বেশ করে ব্যাণ্ডেজটা করুন।"

ব্যাণ্ডেজ করা শেষ হলে গোবর্ধন বললেন, "ভজুয়ার টর্চটা দিয়ে আসি। অন্ধকারে বউটা না হলে আতান্তরে পড়বে।"

"যান।"

আবার বেরিয়ে গেলেন গোবর্ধনবাবু। বৃষ্টিটা আরও চেপে এল। গেরুয়াধারী অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন একটু। আমি কি একজন সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লোকের জন্য এতটা করতুম? এই আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন তিনি।

গোবর্ধনবাবু আবার ফিরলেন মিনিট দশেক পরে। হাতে একটা লণ্ঠন, মাথায় গায়ে একটা কাপড় জড়ানো।

"লণ্ঠন পেয়েছেন একটা? ভালই হয়েছে। গায়ে মাথায় কি জড়িয়েছেন ওটা?"

"ভজুয়ার বউয়ের একখানা শাড়ি। বৃষ্টি শুরু হয়েছে কি না, কিছুতেই ছাড়লে না, বললে কাল ওটা কাচতেই হবে, আপনি এখন গায়ে মাথায় জড়িয়ে নিন ওটা, তা নাহলে আপনার সব ভিজে যাবে।"

"আপনার সঙ্গে চেনা ছিল বুঝি ওদের?"

"হ্যাঁ, এ দিকে এসেছিলাম বার দুই ফুটবল ম্যাচ খেলতে। ওদের বাড়ির কাছেই ফুটবল ফিল্ড্। ম্যাচ খেলবার পরও ছিলাম দিন দুই। এই ঘাট পেরিয়েই শিকারে গিয়েছিলাম। ওপারের জঙ্গলে বটের আছে

অনেক। সেই সময় ভাব হয়েছিল এদের সঙ্গে। অনেক পাখি মেরে-ছিলাম, শুধু বটের না, হাঁসও। এদেরও দিয়েছিলাম, কি করব অত পাখি নিয়ে, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছত না। এইখানে একটা পিকনিক গোছের করা হয়েছিল। ভজুয়ার বউ মসলা পিষেছিল আর জল তুলেছিল ভজুয়া। অনেক লোক জুটে গিয়েছিল। তখন থেকেই আলাপ। ওরা লোক ভালো। এই যে লোকে বাঙালী-বিহারী ফিলিং বলে, সাধারণ লোকের মধ্যে তা তো দেখতে পাই না। যত ফিলিং শিক্ষিতদের মধ্যে—"

"ঠিকই বলেছেন। শিক্ষিতরাই পাজি। শিক্ষিতরা ওদের মতো খেটে খেতে পারে না। তাদের অধিকাংশই নির্ভর করে চাকরির উপর। তাই চাকরিতে কেউ বখরা বসাতে এলে ফিলিংয়ের সৃষ্টি হয়। ইংরেজরা গুণের কদর করত, এরা ভাইপো-ভাগনেদের কদর করে। ইংরেজরা যখন এদেশের প্রভু ছিল তখন তাদের অধীনে আমি চাকরি করেছি। তাদের মহত্ত্বে আমি অভিভূত। আমার বিদ্যে সাধ্যি তেমন ছিল না, কিন্তু আমি কর্তব্যপরায়ণ ছিলাম, আর অসাধুও ছিলাম না। আমার এই দুটো গুণের মর্যাদা তারা দিয়েছিল, এরা দিত না।"

"আপনি পুলিশে কাজ করতেন?"

"সে অনেক পরে। আমার জীবন-কাহিনী বড় বিচিত্র। আর এ বৈচিত্র্যের মধ্যে আমি আগে থাকতে প্ল্যান করে ঢুকি নি। আমার বিশ্বাস কি জানেন? আমাদের প্রত্যেকেরই মাথায় একটি অদৃশ্য টিকি আছে এবং একটি অদৃশ্য হস্ত ধরে আছে সেই টিকিটি। টিকি ধরে সেই হস্ত আমাদের যেখানে নিয়ে যাচ্ছে আমরা যাচ্ছি, যেখানে দাঁড় করাচ্ছে দাঁড়াচ্ছি, যেখানে বসাচ্ছে বসছি। অথচ আমাদের ধারণা আমরাই সব নিজেরা করছি। নিজেদের করবার ক্ষমতা আমাদের কিছু নেই। আমরা সবাই নিয়তির দাস। নিজের জীবন থেকে এই শিক্ষাটি পেয়েছি। আর এও জেনেছি প্রত্যেকের জীবনেই উত্থান পতন দুইই আছে। একটানা উত্থান

বা একটানা পতন কারো জীবনেই নেই। হয় না। প্রাইম মিনিস্টার নেহেরুকেও জেল খাটতে হয়েছিল—”

গোবর্ধনবাবু স্মিতমুখে কথাগুলি শুনলেন। কৌতুক মিশ্রিত ঈষৎ কৌতূহল জাগল তাঁর মনে।

“এখন তো আর কিছু করবার নেই, যদি আপত্তি না থাকে শোনান আপনার জীবন-কাহিনী। শুনে হয়তো কিছু শিক্ষালাভ করব—”

“বলতে আপত্তি নেই, বলছি। কিন্তু যদি ভাবেন শুনে কিছু শিক্ষা-লাভ করবেন তা হলেই ভুল করবেন। অপরের জীবন-কাহিনী শুনে বা অপরের জীবন-চরিত পড়ে কারও কোন শিক্ষা হয় না। মনে একটু সুড়সুড়ি লাগে শুধু। সাধু মহাপুরুষদের জীবনী তো কত রয়েছে বাজারে, স্কুল কলেজে পড়ানোও হয়, কিন্তু সাধু মহাপুরুষ কটা দেখতে পান? ‘ম’ কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী হাজার হাজার বিক্রি হয়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন মাত্র একটি। দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ, দ্বিতীয় বিবেকানন্দ আর তো হল না। হয় না। ওই যে গোড়াতেই বললুম অদৃশ্য টিকি আর অদৃশ্য হাত, আমাদের জীবন ওদেরই লীলা-খেলা। মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে মহাপুরুষ হবার আস্থা জাগে অনেকেরই, কিন্তু হবার উপায় আছে? টিকি ধরে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেইখানে যেতে হচ্ছে। সুতরাং আমার জীবন-কাহিনী শুনে শিক্ষা পাবেন সে আশা করবেন না। শিক্ষার কথা অনেক আছে কিন্তু সে শিক্ষা আপনার কাজে লাগবে না। আপনাকে আপনার টিকির টানে চলতে হবে—”

“কিন্তু একই শিক্ষা বহু লোকের কাজে লাগে না কি? এই ধরুন স্কুল কলেজে অঙ্ক বা ভাষা আমরা সবাই শিখেছি, সেটা কি আমাদের কাজে লাগছে না?”

“কিন্তু সে শিক্ষা পেয়ে আমরা কি সবাই একরকম হয়েছি? যিনি অঙ্কে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট তিনি রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন,

আর যিনি অঙ্কে লাস্ট ক্লাস লাস্ট তিনি তার পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড মোটর হাঁকিয়ে সাঁ করে চলে যাচ্ছেন? এটা কোন্ মন্ত্রবলে হচ্ছে? স্কুল কলেজে আমরা যে শিক্ষা পাই তা অনেকটা জামাজুতোর মতো। সবাই জামাজুতো পরে, কিন্তু সবাই একই রকম হয় না। যে শিক্ষা আমাদের জীবনপথে চালিত করে, যার জোরে আমি আমার বৈশিষ্ট্যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হই তার নামই শিক্ষা। আর সে শিক্ষার প্রেরণা আসে নিজের ভিতর থেকে এবং আমার বিশ্বাস সেটা যোগায় আমাদের অদৃশ্য টিকিধারী অদৃশ্য চালকটি—তার নাম ভগবান, অদৃষ্ট, নিয়তি—যা ইচ্ছে দিতে পারেন, কিন্তু আসল মালিক তিনি—। আমি একবার আশ্চর্য একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম—বড় অদ্ভুত স্বপ্ন—"

"কি রকম?"

"আচ্ছা সেটা যথাস্থান বলা যাবে। জীবন জিনিসটাই বড় মজার—"

"বলুন শুনি আপনার জীবন-কাহিনী। আপনার সঙ্গে কথা ক'য়ে মনে হচ্ছে যেন কোনও উপন্যাস পড়ছি—"

"জীবনই তো উপন্যাস। উপন্যাসে তো জীবনের কথাই সাজিয়ে গুছিয়ে বলেন লেখকরা। বেশ শুনুন। তবে আমার ওই থলিটা একটু এগিয়ে দিন। নস্যি আছে বার করি—"

গেরুয়ার থলিটা এগিয়ে দিলো গোবর্ধন। তার থেকে কাক-মুখো বেশ বড় একটি কৌটো বার করলো গেরুয়াধারী। কৌটোটির উপর বার দুই তিন তর্জনী দিয়ে টোকা দিলেন। তার পর ঢাকনাটি খুলে বেশ বড় এক টিপ নস্যি নিয়ে ভর্তি করে দিলেন নাসারন্ধ্র দু'টি। তার পর টান দিলেন জোরে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল। গেরুয়া পাঞ্জাবির আস্তিনে চোখের জল মুছে গোবর্ধনের দিকে চাইলেন আর একবার।

"সত্যিই শুনবেন ?"

"হ্যাঁ, বলুন না ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করে কয়েক মুহূর্ত মাটির দিকে চেয়ে রইলেন গেরুয়াধারী।

"কোন্‌খান থেকে আরম্ভ করব ? একেবারে ছেলেবেলা থেকে ?"

"তাই করুন না। সমস্ত পিক্‌চারটা পাওয়া যাবে তাহলে।"

"না, তা যাবে না। শেষের দিকটা আঁকাই হয় নি এখনও। আচ্ছা গোড়া থেকে বলছি। নাম ধাম গোপন করে বলব কিন্তু। যাঁদের কথা অনিবার্য ভাবে এসে পড়বে তাঁদের সম্বন্ধে সত্যভাষণ হয় তো তাঁরা পছন্দ করবেন না, সুতরাং নাম-ধাম চেপে যাচ্ছি।"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আর এক টিপ নস্যি নিলেন। তারপর শুরু করলেন ঃ

"ছেলেবেলাটা বড় কষ্টে কেটেছে আমার। বাবা বড় ডাক্তার ছিলেন। খুব বিলাসে লালিত পালিত হচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন হার্টফেল করে বাবা মারা গেলেন। সব ফুরিয়ে গেল। রঙীন ফাঁপা বেলুনটা চুপ্‌সে গেল যেন। শোক কাটতে না কাটতে মা-ও গেলেন। অনেকে সন্দেহ করেন তিনি আফিং খেয়েছিলেন, অনেকে বলেন শোকের আঘাত সহ্য করতে পারেন নি। সে যাই হোক, আমি চক্ষে অন্ধকার দেখলুম। অনেক বাড়িতেই দেখবেন বাড়ির রোজগেরে বাপটি যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন বাড়বাড়ন্ত। বাজার থেকে রোজ কাটা মাছ আসছে, হপ্তায় দু'দিন মাংস, ছেলেমেয়েদের টিউটার, বউয়ের নিত্য নতুন শাড়ি গয়না, বন্ধুবান্ধবদের বৈঠকখানায় বসে তাস পেটা আর চা খাওয়া—কিন্তু কর্তাটি যেই চোখ বুজলেন সব শেষ। যে বাড়ি একটু আগে ইলেক্‌ট্রিক আলোতে ঝলমল করছিল হঠাৎ কে যেন তার মেন সুইচ্‌টা অফ করে

দিলে। চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। আমি অনাথ হয়ে পড়লুম। বাঙালীর ছেলের জীবন-তরী সাধারণত ছ'টি বন্দরের কোন-না-কোন একটাতে ঠেকে থাকে—"

"ছ'টি ?" প্রশ্ন করলেন গোবর্ধন।

"হ্যাঁ ছ'টি, সিক্স্। বন্দর ছ'টি হচ্ছে—বাবার বাড়ি, মামার বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি, রাস্তা এবং শ্মশান। বাবার বাড়ির বন্দর থেকে আমার নৌকো ছাড়ল। মামারা সেটাকে গুন টেনে নিয়ে এলেন নিজেদের বন্দরে। মামার বাড়িতে এসে আশ্রয় পেলাম। প্রথম দু' একদিন বড্ড কষ্ট হয়েছিল। খাওয়া সাধারণ ডাল-ভাত-তরকারি আর এক-আধ টুকরো মাছ। বাবার বাড়িতে যখন ছিলাম, তখন একাই ছিলাম তো, দু'তিন রকম মাছই খেতাম রোজ, মাংস প্রায়ই হ'ত। রাত্রে শুতাম স্প্রিংয়ের গদি-দেওয়া খাটে, নেটের মশারি ছিল। এখানে শুতে হ'ত একটা খাটে, ছারপোকা-ভর্তি দড়ির খাটিয়ায় ময়লা তোশকের উপর। একটা মশারি ছিল বটে, কিন্তু সেটা ছিল মস্কুইটো নেট্ নয়, মস্কুইটো ট্র্যাপ্। অজস্র মশা ঢুকত তার ভিতর। দিনকতক পরে অবশ্য সবই স'য়ে গেল। যে শহরে মামারা বাস করতেন সে শহরের নামটা করব না। হোয়াট্ ইজ্ ইন্ এ নেম। মামাদের নাম করব না। তিন মামা ছিলেন আমার। তিনটি টাইগার। মামার বাড়িতে এসেই কাকার খবর শুনলাম। আমার যে একজন কাকা আছেন সে কথা এক-আধবার বাবা-মার মুখে হয় তো শুনে থাকব, কিন্তু মনে ছিল না। কাকাকে কখনও চোখে দেখি নি। তাঁর সম্বন্ধে মামার বাড়িতে যা শুনলাম তাতে বুঝলাম তিনি একটি নমস্য ধনুর্ধর। আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন, সিভিল সার্জন। তাঁর একটা বিখ্যাত পেটেণ্ট ওষুধ ছিল ম্যালেরিয়ার। আমার কাকা সেই ওষুধের কারবারের দেখাশোনা করতেন। বাবা ভাইয়ের উপর

বিশ্বাস করে নিজে কিছুই দেখতেন না। বাবা সরকারী চাকরি করতেন তো, তাই ওষুধের ব্যবসাটা ভায়ের নামে বেনামী করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল তাঁর ভাই লক্ষ্মণ নন, দুর্যোধন। বাবার সম্পত্তির একটি পয়সা পেলুম না আমি। অথচ শুনলাম কাকা টাকার উপর গড়াগড়ি খাচ্ছেন, রোলিং ইন্ ওয়েলথ্ ! আমি কিচ্ছু পেলুম না। সম্পূর্ণ-রূপে মামাদের পোষ্য হয়ে পড়তে হল আমাকে। সবাই আমাকে অনুকম্পা করত। এমন কি বাড়ির চাকরগুলো পর্যন্ত। খুব খারাপ লাগত। সেই সময় সকলের মুখে মুখে যে আলোচনা শুনতাম এবং কাকার ব্যবহারে যেটা আমার মনে ছাপ রেখে গেল সেটা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ায় টাকা জিনিসটা তুচ্ছ নয়। ওটার এমন একটা ভয়ানক দাম আছে যা অনায়াসে ভাইকে ভাইয়ের শত্রু করে তুলতে পারে। আমারও শিশু মনে আকাঙ্ক্ষা জাগল টাকা রোজগার করতে হবে। দিদিমাকে চুপিচুপি একদিন জিগ্যেসও করলাম, দিদিমা আমি কবে টাকা রোজগার করব। শুনে তো তিনি হেসেই আকুল। তারপর বললেন, "আগে লেখাপড়া শিখে মানুষ হও, তবে তো টাকা রোজগার করবে। মুখ্যুরা তো টাকা রোজগার করতে পারে না। লেখাপড়া শিখলে তখন তো চাকরি হবে। সাহেবদের কাছে কদর হলেই সব হবে।"

গোবর্ধন বললেন, "আমার বাবারও ওই ধারণা ছিল। তাই যতদিন না আমি এম-এ পাশ করলুম ততদিন ফিঙের মতো লেগেছিলেন আমার পিছনে। বাবার তামাক সাজতুম আর পরীক্ষার পড়া পড়তুম। কিন্তু কি হল, কিছুই হল না—"

"আপনি এম-এ পাশ নাকি ? বাঃ—! আমি মশাই মুখ্যু মানুষ, কোনও রকমে ঘেঁচড়ে মেচড়ে ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিলুম। মামারা আমাকে ওখানকারই একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেখানেই

আমার মা সরস্বতীর সঙ্গে যা কিছু পরিচয় হবার হয়েছিল। মা সরস্বতী না বলে ম্যাডাম সরস্বতী বলাই ভালো, কারণ স্কুলটি ছিল ক্রিশ্চান মিশনারিদের।"

আর এক টিপ নস্য নিলেন গেরুয়াধারী।

"লেখাপড়ায় মোটেই ভালো ছেলে ছিলাম না। ওই কোনরকমে ঘেঁষটে-মেষটে প্রমোশনটা পেতাম। ফেল করিনি একবারও। আমি লেখাপড়ায় ভালো ছিলাম না বটে, কিন্তু 'চলতা পুর্জা' ছিলাম। মাস্টার মশাইরা সকলে ভালোবাসতেন আমাকে। স্কুলেরও অনেক ছেলে ভালো-বাসত, অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। ক্রিশ্চান স্কুলে নানা জাতের ছেলে থাকে। ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান তো থাকেই, হিন্দু মুসলমানও থাকে। আমাদের স্কুলে 'জু'ও ছিল দু'একটা। ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চানদের, বিশেষত সাঁওতাল ক্রিশ্চানদের, খুব ভালো লাগত আমার। তাদের মধ্যে সাঁওতালি সরলতার সঙ্গে সাহেবী আদবকায়দার সমন্বয় এত ভালো লাগত যে কি বলব। এই স্কুলে ডেভিস আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। সে-ও আমার মতো পড়াশোনায় তেমন ধারালো ছিল না, কিন্তু সে জানত কোন্ গাছে হলদে পাখি বাসা বাঁধছে, কাদের গাছে পেয়ারা পাকছে, শীতকালে নদীর চড়ায় হাঁসরা আসতে আরম্ভ করেছে কি না। হাঁসের খবর সে দিত আমাদের থার্ড মাস্টার লম্বোদরবাবুকে। তিনি শিকার করতে ভালো-বাসতেন খুব। কোন্ মাস্টার কি খেতে ভালবাসেন তার খবরও রাখত সে। হেড মাস্টার মশাইকে প্রায়ই মুলোটা কলাটা এনে ভেট দিত নিজেদের বাগান থেকে। আরও খবর রাখত নানারকম। বিশেষ করে চেনাশোনা কারও বাড়িতে কেউ অসুখে পড়েছে কি না। চেনাশোনা কারও বাড়িতে অসুখ করলে আমরা সেখানে নাইট-ডিউটি করতে যেতাম। আমাদের স্কুলে সমাজ-সেবা দল ছিল, কোথাও কলেরা হলে, কোথাও বন্যা হলে, কারও বাড়িতে অসুখ করলে সেই দলের ছেলেরা যেত সেবা

করতে। তাদের সঙ্গে একজন শিক্ষকও থাকতেন। ডেভিস ছিল সেই দলের সেরা পাণ্ডা। আমিও সেই দলের ছিলাম।"

গোবর্ধন বললেন, "আমাদের স্কুলেও ওই রকম একটা দল ছিল। কিন্তু বাবা আমাকে কোথাও যেতে দিতেন না।"

"তামাক সাজার অসুবিধা হবে বলে বোধ হয়।"

"না, তা ঠিক নয়। বাবা এক অদ্ভুত ধরনের আদর্শবাদী লোক। তাঁর বিশ্বাস ছেলেরা কচি গাছের মতো, তাদের যদি ঠিক মতো বেড়া দিয়ে ঘিরে রক্ষা না করা যায় তাহলে গরু ছাগলে তাদের মুড়িয়ে খাবে। তারা আর বাড়তে পাবে না। আমাকে তাই চিরদিন বাবার কাছেই থাকতে হয়েছে। বাবা আমাকে যেখানে সেখানে যে সে মনিবের কাছে চাকরি পর্যন্ত করতে দেন নি।"

"হ্যাঁ, ও ধরনের একটা হিসেব আছে বটে। কিন্তু সবাই এ হিসেব রাখতে পারে না। আমার তো বাবা মা কেউ ছিল না, হিসেব রাখবে কে। মামাদের মধ্যে একজন কোলকাতায় ডাক্তারি করতেন আর বাকী দু'জন বাড়ির খেয়ে চাকরি করতেন, একজন কমিশনার্স আপিসে, আর একজন কালেক্টারের আপিসে। সেকালের বাঙালী সমাজের দুটি স্তম্ভ ছিলেন দুজন। তাঁরা নটার সময় খেয়ে আপিসে বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন সন্ধ্যার সময়। ফিরে চা জলখাবার খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে আবার বেরিয়ে যেতেন তাস পাশার আড্ডায়। আমি কি করছি না করছি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না কেউ। মামীমারাও করতেন না, তাঁরা ব্যস্ত থাকতেন রান্নাঘরে। আশ্রিত ভাগ্নেটা কি করছে না করছে, পড়াশোনা করছে কি না এ সব খোঁজ রাখা তাঁরা তাঁদের জুরিসডিক্‌শনের বাইরে মনে করতেন, ছেলেদের খোঁজ রাখাটাই তাঁরা তাঁদের জুরিসডিক্‌শনের বাইরে মনে করতেন। নিজেদের ছেলেদেরও খোঁজ রাখতেন না। সন্ধ্যের সময় পড়াতে আসতেন জগু মাস্টার।

ক্ষীণ-দৃষ্টি ভীতু লোক। তারই উপর ভার ছিল আমাদের পড়াশোনার। মেজমামা বাঘা লোক ছিলেন, কথায় কথায় লোককে জুতো নিয়ে মারতে দৌড়তেন, শহরের সকলেই তাঁকে ভয় করত, কমিশনার সাহেবের দক্ষিণহস্ত ছিলেন তিনি। ভয় না করে উপায় ছিল না। যাদের বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা তিনি 'কচে বারো ছত্তিন্ নয়' প্রভৃতি পাশার বোল সগর্জনে আউড়ে বাড়িসুদ্ধ লোককে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন, তারাও কেউ কখনও বিরক্ত হয় নি তাঁর উপর। বরং তিনি তাদের বাড়িতে এসে অনুগ্রহ করে পাশা খেলছেন এতে যেন কৃতার্থ হয়ে যেত সবাই। এর কারণ আতিথেয়তা নয়, এর কারণ প্রতাপ এবং টাকা। কোনও বাজে-মার্কা গরীব লোক যদি রোজ বাড়িতে এসে ওইরকম হাল্লা করত তা হলে তারা তাড়িয়ে দিত তাকে।"

"তা ঠিক বলা যায় না সব সময়ে"—কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন গোবর্ধন—"ছোটবেলা থেকে আমার কুকুর পোষার শখ। ভালো কুকুরের অনেক দাম, তা কেনবার মতো পয়সা অবশ্য ছিল না, কিন্তু দেশী কুকুরের বাচ্চা পেলেই পুষতাম। পুষে বেঁধে রাখতে হত, তা না হলে ঘরদোর নোংরা করত। কিন্তু কুকুরের বাচ্চাকে বেঁধে রাখলে যে কি রকম চেঁচামেচি করে তা জানেন বোধহয়। দিনরাত চেঁচাত। কিন্তু বাবা মা কেউ বিরক্ত হন নি—"

"হন নি তার কারণ আপনি। ছেলের খেয়াল মেটাবার জন্য মা বাপ সব সহ্য করতে পারে। আমি মাতাল ছেলের হাতে বাপকে মার পর্যন্ত খেতে দেখেছি, মাকে অম্লান বদনে গয়না খুলে দিতে দেখেছি। হ্যাঁ, কি বলছিলুম, জগু মাস্টারের কথা। ভীতু ক্ষীণদৃষ্টি লোক ছিল সে। মাসে পাঁচ টাকা মাইনে পেত। আমাদের পড়াত না, খোশামোদ করত, পাছে মামাকে আমরা তার নামে কিছু বলে দি। তবে একটা ভাল কাজ করত সে। আমাদের সঙ্গে সর্বদা ইংরেজিতে কথা বলত।

আমাদেরও ইংরেজিতে উত্তর দিতে হত। এর ফলে ইংরেজিটা বেশ বলতে কইতে পারতাম। এ জিনিস পরে কাজে লেগেছিল, খুব কাজে লেগেছিল। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।”

হঠাৎ চুপ করে গেলেন গেরুয়াধারী। কান পেতে কি শুনতে লাগলেন বাইরে। ঝড় জলের শব্দের সঙ্গে আর একটা আলোড়নের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

“ওটা কিসের শব্দ বলুন তো—”

“গঙ্গার জল তোলপাড় করছে।”

“ও!”

আর এক টিপ নস্যি নিলেন।

তারপর শুরু করলেন আবার।

“আগেই বলেছি ছেলেবেলা থেকে সবাই একটা ধারণা মনের মধ্যে যেন কাঁটির মতো ঠুকে বসিয়ে দিয়েছিল—টাকা রোজগার করতে না পারলে জীবনই ব্যর্থ। টাকা চাই, টাকা। লেখাপড়া শিখে কি হবে? লাছুরাম মাড়োয়ারি কি লেখাপড়া জানে? ক অক্ষর গোমাংস। কিন্তু তার দুটো ল্যাণ্ডো, তিনটে মিল, প্রকাণ্ড বড় কাপড়ের দোকান। সবাই তাকে সেলাম করে। আজকাল মিনিস্টাররা পর্যন্ত তার ভয়ে জুজু হয়ে আছে। অনেক ভোট তার হাতে। লাছুরামকে আমার হিংসে হ'ত, কিন্তু এ-ও আমি জানতাম আমি লাছুরাম হতে পারব না। বামন চাঁদে হাত দিতে পারে না, ওদের মতো টাকা রোজগার করবার শক্তি সামর্থ্য ফন্দি ফিকির আয়ত্ত করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল—আমি চাকরি করে বড়বাবু হতে পারি। আমার মামা সেকালের এণ্ট্রান্স পাশ, কিন্তু কি তার প্রতাপ, কি দবদবা, কমিশনার সাহেব হাতের মুঠোর মধ্যে। বাড়িতে দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী-পূজা, অন্নপূর্ণা পূজা, সরস্বতী পূজা সব হ'ত। কমিশনার সাহেবের

বড়বাবু ছিলেন বলেই এত সব পেয়েছেন। অবশ্য তিনি কমিশনার সাহেবকে খুব ঝুঁকে সেলাম করতেন এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু ও রকম চাকরি পেলে আমিও সেলাম করতে রাজী ছিলাম। মোটকথা ছেলেবেলা থেকে চাকরিই আমার ধ্যানজ্ঞান ছিল, লেখাপড়া নয়—”

গোবর্ধন বললেন, “সেলামের কথা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। বলব? আমার বাবা যে কি রকম খামখেয়ালী তাহলে বুঝতে পারবেন।”

“বলুন—”

“অনেক ধরাধরির পর এক জায়গায় অনেক কষ্টে আমার চাকরি হল একটা। চাকরিতে গিয়ে জয়েন করলাম। বেশ ভালই লাগল। মাইনে দেড়শ' টাকা। সন্ধ্যের সময় ফিরে আসতেই বাবা জিগ্যেস করলেন—‘কি রকম আপিস?’ বললাম, ‘ভালই, তবে একটা রুল দেখলুম একটু ইয়ে গোছের।’ বাবা জিগ্যেস করলেন—‘ইয়ে মানে?’ ‘মানে আপিসের প্রথম রুলটা হচ্ছে কোনও ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা হলেই কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করতে হবে’। বাবা তৎক্ষণাৎ বললেন, ‘ও চাকরি করতে হবে না। মানুষের আত্মসম্মান সবচেয়ে বড়। যেতে হবে না ও আপিসে। এক কলকে তামাক সাজ—”

“অদ্ভুত লোক তো আপনার বাবা। চাকরি কখনও করেন নি কি না, তাই চাকরির মর্ম বোঝেন না। স্বাধীন জীবিকা শুনতেই ভালো, কিন্তু ওই স্বাধীন জীবিকায় যত লোককে তেল দিতে হয় চাকরিতে তত হয় না।”

গোবর্ধন উসখুস করছিলেন, শেষে উঠে দাঁড়ালেন।

“আসছি একবার—”

“আবার এই বৃষ্টিতে কোথায় বেরুচ্ছেন?”

"ভিজতে আমার ভারি ভালো লাগে।"

ভজুয়ার বউয়ের শাড়িখানা মাথায় গায়ে জড়িয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন গোবর্ধন। গেরুয়াধারী বলে উঠলেন, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

গোবর্ধন ফিরলেন মিনিট কুড়ি পরে।

"আর একটু হলেই ফসকে গিয়েছিল—"

"কি?"

"তামাক খাওয়াটা। অনেকক্ষণ থেকেই ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সঙ্গে তো কোন সরঞ্জাম নেই। হঠাৎ মনে পড়ল ভজুয়ার বউ তামাক খায়। শিকারে যখন এসেছিলাম তখন তাকে তামাক খেতে দেখেছিলাম। গিয়ে দেখি খাচ্ছে। আর একটা মুশকিল হ'ল দ্বিতীয় হুঁকো নেই। স্বামী-স্ত্রীর একটি হুঁকো। শেষে হাতে করে' গাঁজা খাওয়ার ভঙ্গীতেই খেলাম। ভজুয়ার বউ বললে ও বাজার থেকে আমার জন্য একটা হুঁকো আনবে—"

"এই বৃষ্টিতে আপনার জন্যে হুঁকো কিনতে বাজার গেল নাকি?"

"ও ভজুয়াকে খুঁজতে বেরুচ্ছে। ওর ভয় হচ্ছে মদ খেয়ে যদি নর্দমায় পড়ে এ দুর্যোগে তাহলে আর বাঁচবে না। এতক্ষণ তার ফেরা উচিত ছিল। নিন্, এইবার শুরু করুন আপনার গল্প, চমৎকার লাগছে—"

"এখনও তো কিছুই শোনেন নি। এই অদৃশ্য হস্ত আমার অদৃশ্য টিকি ধরে যে কত জায়গায় ঘুরিয়েছে তা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ—"

"যদি একটা কথা জিগ্যেস করি, মনে কিছু করবেন কি?"

"না। স্বচ্ছন্দে করুন।"

"মধ্যে মধ্যে ওঁ তৎসৎ বলছেন কেন অমন করে ?"

"সম্প্রতি যাঁর কাছে মন্ত্র নিয়েছি, যিনি বলেছেন যে আমার অন্ধকার কেটে গিয়ে আবার সূর্য উঠবে, তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন দিনে রাত্রে যতবার পার ওঁ তৎসৎ বলবে। তাঁর আদেশ পালন করে যাচ্ছি।"

"এইবার বলুন আপনার গল্প।"

"হ্যাঁ, কোন্ পর্যন্ত বলেছিলাম ?"

"আপনার স্কুলের জীবনের কথা বলছিলেন।"

"ম্যাট্রিক পাশ করবার পর মামা আমাকে ক'লকাতায় পাঠিয়ে দিলেন আর এক মামার কাছে। উদ্দেশ্য তাঁর কাছে থেকে কলেজে পড়া। মামা ডাক্তার ছিলেন, ক'লকাতায় প্র্যাকটিস করতেন। রয়াল বেঙ্গল টাইগার একটি। চোখের দিকে চাইলে বুকের রক্ত শুকিয়ে যেত। ইয়া ভারী থমথমে মুখ, ভুঁড়ো নাক, থ্যাবড়া চিবুক, মজবুত চোয়াল। ভাঁটার মতো বড় বড় চোখ। ভুরু নেই। প্রকাণ্ড টাক এসে মিশেছে চওড়া কপালে। দুটোয় মিলে গড়ের মাঠ হয়ে গেছে একেবারে। এই মামার পাল্লায় এসে পড়লাম। প্রথম দর্শনেই তিনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার দিকে খানিকক্ষণ। মনে হল একটু যেন হাসির আভাস ফুটি ফুটি করছে তাঁর গম্ভীর মুখে। বললেন, 'খুব লম্বা হয়েচিস তো। প্রায় আমার সমান হয়ে গেছিস।' এটা আমার অপরাধ না গৌরব তা বুঝতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম। মামা বললেন, 'স্কটিশ চার্চ কলেজে বলে রেখেছি। কাল সকাল সকাল খেয়ে তৈরি হয়ে থেকো, সঙ্গে করে নিয়ে যাব।' পরদিন তিনি আমাকে সোজা স্কটিশ চার্চে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলেন, তারপর সংক্ষেপে বলে দিলেন, 'মন দিয়ে পড়াশোনা কর। আর একটি কথা মনে রেখো, আমি বেশী উপদেশ দিই না, দরকার হলে

হাত চালাই। তাতেও যদি কাজ না হয় দূর করে দি'। ভয়ে জুজুটি হয়ে রইলাম। রোজ কলেজে যাই, নিয়মিত সময়ে ফিরে আসি। মামা বই পত্তর খাতা পেন্‌সিল সব কিনে দিলেন। তখন ফাউনটেন পেনের এত ছড়াছড়ি হয় নি। কলেজের নোটটোট সব পেন্‌সিলেই লিখতে হত। তারপর দরকার হলে দোয়াত কলমের সাহায্যে সেগুলো 'ফেয়ার' করতে হ'ত বাড়িতে। মামার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া ভালই হ'ত। দু' পীস করে পাকা মাছ দুবেলাই পেতাম। সকালে বাসি রুটি আর গুড়। কলেজ থেকে এসে পরোটা বা লুচির সঙ্গে আলুর ছেঁচকি। সে বিষয়ে কোনও খুঁত ছিল না। আমি অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলাম অন্য কারণে। আমার 'পকেট-মনি' বলে কিছু ছিল না। আমার যখন যা দরকার হ'ত মামা নিজেই গিয়ে কিনে দিতেন। জামা, কাপড়, জুতো সব। আমার হাতে কাঁচা পয়সা দিতেন না কখনও। আমারও যে একটা হাত-খরচ দরকার এ হুঁশ তাঁর হত না। একটি পয়সা হাতে তুলে দেননি কখনও। তাঁর ধারণা ছিল হাতে পয়সা পেলেই ছেলেটা বিগড়ে যাবে। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে। পয়সা না পেয়েও বিগড়ে গেলাম। কলকাতা শহরে প্রলোভন কত। আর আমার সঙ্গীরা কলেজে সর্বদাই এটা-ওটা কিনত। কখনও চানাভাজা, কখনও ঝালমুড়ি, কখনও ডালমুট, কখনও ঘুগনি কত কি। রেস্টুরেণ্টে চা কফি কেক বিস্কুট সবাই খেত। আমি মুখটি চুন করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম দূর থেকে। কখনও কমনরুমে বসে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতুম। কিন্তু প্রাণের ভিতরটা খাঁ খাঁ করত। আত্মসম্মানে আঘাত লাগত যেন। ক্রমশ জীবনে ঘেন্না ধরে গেল। ভাবলুম এমনভাবে পরের হাত-তোলা হয়ে কতদিন আর থাকব। লেখাপড়া শিখেই বা হবে কি! তাছাড়া লজিকটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছিল না। বড়ই মনমরা হয়ে দিন কাটাতে লাগলুম। একদিন

হেদোর ধারে বেড়াচ্ছি এমন সময় ডেভিসের সঙ্গে দেখা। আমার সেই স্কুলের বন্ধু ডেভিস। তার চেহারা দেখে আমি তো অবাক! ঠোঁটের কোণে সিগারেট ঝুলছে, পরনে সাহেবী পোশাক, পায়ে চকচকে জুতো। তার চলন বলন হাবভাব ভঙ্গী একেবারে সাহেবের মতো। দেখে তাক লেগে গেল।"

আমিই এগিয়ে গিয়ে সম্বোধন করলাম তাকে। সে আমাকে দেখতে পায় নি।

"কি রে ডেভিস যে। কোথা আছিস? খুব সুখেই আছিস মনে হচ্ছে।"

"আরে সাণ্ডেল নাকি! তুই এখানে কোথা?"

"আমি স্কটিশে পড়ি। তুইও পড়চিস নাকি কোথাও?"

"না, আমি চাকরি করি। কলকাতাতেই থাকি।"

"চাকরি? কি চাকরি করছিস? তুই তো ম্যাট্রিকও পাশ করতে পারিস নি।"

"আমি যে চাকরি করছি তাতে কোন পাশের দরকার নেই, ডাঁট থাকলেই হল। তুই যদি চাস তাহলে তোকেও জুটিয়ে দিতে পারি সে-চাকরি। খালি হয়েছে একটা পোস্ট—"

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম।

"কি রকম চাকরি?"

"ভাল চাকরি। ত্রিশ টাকা মাইনে পাবি। তোর নাম হবে সাহেব অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। তোর under-এ একটা কেরানী থাকবে। তুই থাকবি ঠিক সাহেবের মতো। Stair case আলাদা, closet আলাদা, কোম্পানি তোকে লাঞ্চ খেতে দেবে। তোর মাইনে তোকে গিয়ে আনতে হবে না। খামে ভরে তোর টেবিলে দিয়ে যাবে ঠিক তারিখে। কিন্তু একটি কথা ভাই, সর্বদা ইংরেজিতে কথা বলতে হবে।

তোর under-এ বা অপর কারুর under-এ যে বাবুরা থাকবে তাদের কারও সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পারবে না। আপিসের ভিতর কদাচ বাংলা কথা উচ্চারণ করবে না। পারবি তো?"

"তা চালিয়ে নেব কোনরকমে। ভুলটুল হবে হয়তো, কিন্তু চালিয়ে নেব।"

"কি করছিস তুই আজকাল—"

"স্কটিশে পড়ছি।"

"ছোঃ, কলেজে পড়ে তো অক্‌স্‌ডাং (oxdung) হবি। চলে আয় তুই আমার আপিসে।" •

"কিন্তু আমার যে ভাই সাহেবী পোশাক নেই। পোশাক কেনবার পয়সাও নেই। মামার গলগ্রহ হয়ে আছি। সাহেবী পোশাক পারওনি কখনও, টাই বাঁধতেও জানি না।"

ডেভিস আমার পিঠ চাপড়ে বললে—"সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু ভয় নেয় তোর। আমি তোর ওল্‌ড ফ্রেণ্ড, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আজ মাইনে পেয়েছি। তুই কাল সকাল সাড়ে সাতটায় সাত নম্বর চাঁদনি চকে চলে আয়। আমি থাকব সেখানে। আমার চেনা দোকান। সব ঠিক করে দেব তোর।...পরদিন ভোরবেলা উঠে কাউকে কিছু না বলে পৌঁছে গেলাম সাত নম্বর চাঁদনি চকে। ডেভিস উপস্থিত ছিল। সে আমাকে নিয়ে একটা দোকানে ঢুকল। পাঁচ টাকা দিয়ে জিনের একটা সাদা স্যুট কিনে দিলে। তখনকার দিনে হ'ত, অবশ্য স্যুট মানে প্যাণ্ট, কোট আর টাই। দোকানের আয়নার সামনে দাঁড় কারয়ে আমাকে শিখিয়ে দিলে কি করে টাই বাঁধতে হয়। বার কয়েক বেঁধে আর খুলে রপ্ত করে নিলাম ব্যাপারটা। তারপর ডেভিস নিয়ে গেল আমাকে চিনে বাজারে। সেখানে ন'সিকে দিয়ে এক জোড়া জুতোও কিনে দিলে। এই সাত টাকা চার আনা ধার করে আমার

চাকরি জীবন আরম্ভ হল। পরের মাসেই অবশ্য টাকা শোধ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তার স্নেহের ধার শুধতে পারি নি। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।”

গেরুয়াধারী চুপ করে যেন আত্মস্থ হয়ে রইলেন। বাইরের হাওয়ার দাপটে একটা ছোট জানলা দম্ করে খুলে গিয়ে আলোটা নিবে গেল। গোবর্ধনবাবু তাড়াতাড়ি উঠে জানলাটা বন্ধ করে দিলেন।

“তারপর? চাকরিতে জয়েন করলেন?”

“হ্যাঁ, সেই দিনই ডেভিস আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানির দোকানে ম্যাকফারসন্ সাহেবের কাছে। রাস্তায় যেতে যেতে সে আমাকে বললে, ‘তোমাকে কিন্তু নিজেকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলে পরিচয় দিতে হবে। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কিছু বললাম না। তারপর বললে, ‘তোমার নামের বানানটা এমনভাবে করবে যেন সাহেবী-সাহেবী মনে হয়। অনিল সাণ্ডেল লিখলে চলবে না। বানান করতে হবে O'neil Sawnyell—এই ভাবে। আপিসে গিয়ে ডেভিস নিজেই একটা দরখাস্ত লিখে নিয়ে এসে বলল—এইখানে সই কর। ঠিক ওই রকম বানান করবি। ওই রকম বানানেই সই করলাম বটে, কিন্তু মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, এ করছি কি? হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে, অতবড় বংশের বংশধর, এ কি দুর্মতি ঘিরেছে আমাকে। কিন্তু তখন আর পিছুবার উপায় ছিল না। স্যুট জুতো কেনা হয়ে গেছে।…ডেভিস দরখাস্ত নিয়ে ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই সাহেব ডাকল আমাকে। সেলাম করে গিয়ে দাঁড়ালাম।

চেহারাটা আমার ভালই ছিল। আপাদমস্তক দেখলেন আমাকে। নতুন জুতো, নতুন স্যুটে মানিয়েছিল বেশ। প্রথমেই জিগ্যেস করলে—What are you? আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম, I am a man.

শুনে হা হা করে হেসে উঠল ম্যাকফারসন্। দরাজ হাসি ছিল লোকটার। তারপর বললো I know you are a man, but what is your nationality ? বললাম, I am an Indian. Anglo-Indian কথাটা আর মুখ দিয়ে বেরুল না। তারপর ম্যাকফারসন্ যা করলে তা অদ্ভুত। পকেট থেকে দুটো গুলি বার করে একটা টেবিলের উপর রাখলে, আর একটা আমার হাতে দিলে। তারপর বাঁ চোখটা কুঁচকে বললে—Strike ! গুলি খেলায় বাল্যকাল থেকেই দক্ষ ছিলাম, টকাস্ করে মেরে দিলাম। সাহেব বললে—অল্ রাইট্, I appoint you. সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডেভিস্ বললে, সাহেবের একটু মাথার ছিট্ আছে। আমাকে পাঞ্জা ধরতে বলেছিল। ও একটু পাগলাটে গোছের—"

গোবর্ধন হেসে বললেন, "একবার এক পাগলাটে সাহেবের পাল্লায় পড়ে আমার একবার চাকরি গিয়েছিল। শুনবেন গল্পটা ?"

"বলুন—"

"পাগলাটে সাহেবেরা সাধারণত লোক ভালো হয়। অপ্রত্যাশিত-ভাবে অনেকের উপকার করে। আপনার যেমন করেছিল, কিন্তু আমার বেলায় ঠিক উল্টো হয়ে গেল। তখন একটা পোস্টাফিসে চাকরি করি, টেলিগ্রাম স্কুল থেকে পাশ করে টেলিগ্রামে চাকরি পেয়েছিলাম। বেশ চাকরি, কোন ঝঞ্ঝাট নেই। বাবাও আপত্তি করে নি। কিন্তু কোত্থেকে ওই ম্যাজিস্ট্রেট শনির মতো জুটল আমার কপালে। কোন্ সময়টা জানেন ? তখন বিহারে ভূমিকম্প হয়েছিল। নাইন্‌টিন থার্টিফোর। চারদিকে তখন হাহাকার। বাড়ি ঘর-দোর পড়ে গেছে অনেকের, ট্রেন চলাচলও বন্ধ। টেলিগ্রাফের লাইনও ছিঁড়ে গেছে অনেক জায়গায়। দোকান-পাটও বন্ধ। সে এক বিশৃঙ্খল ব্যাপার। চারদিকে কেমন যেন থমথমে আবহাওয়া—"

"খুব জানা আছে আমার। আমি তখন রিলিফ গাড়ি নিয়ে ঘুরছি ব্রেট সাহেবের সঙ্গে। আমার ভাগ্যোদয় হয়েছে তখন। পরে বলব সে কথা। তারপর বলুন—"

"সেই সময় একটা ম্যাজিস্ট্রেট ছিল ওখানে, অদ্ভুত প্রকৃতির লোক সে। মোটর ছিল, মোটর চালাতে জানত, কিন্তু ঘুরত সাইকেলে। তাঁর মত ছিল মোটরে চড়ে ঘুরে বেড়ালে সাধারণ লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। শুনতাম খুব নাকি বিদ্বান লোক। আসবাবের মধ্যে ছিল কয়েক কেস মদ, আর কয়েক বাক্স বই। কামাতো না। কটা কটা এক মুখ গোঁফ দাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াত, আর সিগারেট খেত অনবরত। কালো কালো সিগারেট, লোকে বলত ইজিপ্‌সিয়ান সিগারেট। একদিন তার বেড্‌ সুইচ্‌টা খারাপ হয়ে গেল। দোকানদার বললে, বেড্‌ সুইচ্‌ আমার নেই। কোলকাতা থেকে আনিয়ে দেব, কিন্তু যেরকম বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখছেনই তো, আজই যদি অর্ডার দিই মাসখানেকের আগে আসবে না। শুনে সাহেব গুম হয়ে রইল। তারপর বলল, তোমার কাছে হাণ্ড্রেট ওয়াটের বাল্‌ব ক'টা আছে? দোকানদার বলল—তা শ' দুই হবে। সব পাঠিয়ে দাও আমার ওখানে—বলে সাহেব চলে গেল। রাত্রে শুয়ে শুয়ে না পড়লে সাহেবের ঘুম আসত না। পড়তে পড়তে যখন ঘুম পেত তখন বেড্‌ সুইচ্‌টি টিপে আলো নিবিয়ে দিত। বেড্‌ সুইচ্‌ যখন পাওয়া গেল না, তখন সাহেব কি করলে জানেন, যেই ঘুম আসত অমনি মাথার শিয়র থেকে রিভলবার বার করে বাল্‌বটা লক্ষ্য করে গুলি করত। হাতের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। দম্‌ করে কেটে যেত বাল্‌বটা, সায়েব ঘুমিয়ে পড়ত। যতদিন না বেড্‌ সুইচ্‌ পাওয়া গেল ততদিন রোজ এইভাবে একটা করে বাল্‌ব ভাঙ্‌তো। অদ্ভুত খেয়ালী লোক ছিল। দিনে আপিস করত না। কোর্টে আসত খালি।

আর আপিসের ফাইল যেত বাড়িতে। স্টেনোকে বলত দিনের বেলা তোমাকে আপিসে আসতে হবে না। রাত্রি নটাব পর আমার বাড়ি যেও। স্টেনোর নাম ছিল মতিবাবু। তাঁর মুখে শুনেছি, সে এক দুর্গতি হয়েছিল তাঁর। সাহেব বসে ডিক্‌টেশন দিত না। লম্বা বারান্দায় পায়চারি করতে করতে দিত। আর মতিবাবু তাঁর পিছনে পিছনে খাতায় সেগুলো টুকতে টুকতে যেতেন। টোকা হয়ে গেলে সাহেব সংশোধন করতেন সেগুলো। মতিবাবুর দিকে চেয়ে বলতেন, মোটি, ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল। আমি যা বলেছি তার প্রায় অর্ধেক ঠিক লিখেছ। গুড্। এই সাহেব আমার চাকরি খেয়ে দিলে।"

"কেন, কি হয়েছিল ? সায়েবরা প্রায় চাকরি খায় না।"

"সমস্ত দিন সিগারেট খেতে না পেয়ে ক্ষেপচুরিয়াস্ হয়ে গিয়েছিল। তখন ভূমিকম্পের সময় তো, নানারকম গুজব উঠেছে শহরে। মুঙ্গের মজঃফরপুর ধ্বংস হয়ে গেছে। গুজব উঠতে লাগল এর চেয়েও প্রচণ্ড ভূমিকম্প আবার হবে। সবাই বলতে লাগল এটা যা হয়েছে সেটা ভূমিকা মাত্র। গ্রন্থারম্ভ পরে হবে। একটা গুজব উঠলেই আর ঘরে ঢুকতে সাহস হত না কারও। সেই দুর্জয় শীতে সবাই খোলা মাঠে শুত। আর রোজই নূতন গুজব। হিমালয় নাকি ধসে পড়ছে, সমস্ত নদী নাকি ফুলে ফেঁপে সমস্ত দেশ ডুবিয়ে দেবে। টেলিগ্রাফেও এই সব খবর আসত কোলকাতা থেকে। টেলিগ্রাফের বাবুরা যে যা শুনত তা জানিয়ে দিত পরের স্টেশনে। এইভাবে আমি একদিন জানতে পারলুম যে তার পরদিন এমন একটা 'শক্' (shock) হবে যা পৃথিবীর ইতিহাসে কোনদিন হয় নি। ফেটে চৌচির হয়ে যাবে চতুর্দিক, তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি আর বান হবে। আমি যখন মেসেজটা পেলাম তখন শহরের একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন টেলিগ্রাফ করতে। তাঁকে বললুম আমি খবরটা। তারপর দিন শহরের দোকান-পাট সব

বন্ধ. শহরের সমস্ত লোক জড় হয়েছে গিয়ে শহরের বাইরের মাঠে। আর হবি তো হ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরও সেদিন দেশলাই ফুরিয়েছে। সাহেবের চাপরাশি বাজার থেকে ফিরে এসে তাঁকে বললে, দেশলাই কোথাও পাওয়া গেল না। বাজার সব বন্ধ। সাহেব জিগ্যেস করলে—বন্ধ কেন? সে বললে, শুনতে হেঁ আজ বড়া জোর ভূকম্প হোগা। হাম্ ভি ছুট্টি মাংতে হেঁ। ' সাহেব কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ল সাইকেল নিয়ে। মাঠে গিয়ে দেখে লোকে লোকারণ্য। একজনকে ডেকে জিগ্যেস করলে—তোমরা এখানে ভিড় করছ কেন? সে বললে শুনছি আজ ভয়ানক ভূমিকম্প হবে। সাহেব বলল—ভূমিকম্প হবে কি না তা তো আগে থাকতে বলা যায় না। তুমি কার কাছ থেকে শুনেছ? লোকটা আমতা আমতা করতে লাগল। সাহেব বললে—লুক হিয়ার, আমি এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট, কে তোমাকে এ খবর দিয়েছে তার কাছে আমাকে নিয়ে চল, তা না হলে এখুনি তোমাকে অ্যারেস্ট করব। আমি ধরে নেব তুমিই এই প্যানিক্ সৃষ্টি করেছ। এমনিভাবে ট্রেস (trace) করতে করতে সাহেব শেষে আমার কাছে এসে হাজির। জিগ্যেস করলে, তুমিই এই খবর ছড়িয়েছ? সত্যি কথা বললাম। সাহেব পোস্টাফিসে দাঁড়িয়েই ফোন করলে পি. এম. জিকে। বললে, তোমাদের একজন টেলিগ্রাফ ক্লার্ক শহরে ভয়াবহ মিথ্যে গুজব ছড়িয়ে সমস্ত শহরকে তোলপাড় করে তুলেছে। ওকে এখুনি দূর করে দাও। তারপর আমার দিকে ফিরে জিগ্যেস করলে, তোমার পুরো নাম কি? নাম বললাম। তার পরদিন বাই ওয়্যারে আমার চাকরি গেল। বুঝুন। আমার দোষ কি বলুন? এক হিসেবে অবশ্য নিশ্চিন্ত হলাম। ওই, ভূমিকম্পের আবহাওয়া থেকে বাবার কাছে পালিয়ে গেলাম। বাবা বললেন, বেশ হয়েছে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। ভাল করে তামাক সাজ দিকি এক কলকে। তুই যাওয়ার পর থেকে জুৎ করে তামাকই খেতে পাই নি। এরা কেউ

কিছু সাজতে জানে না। তোমার বউ তো এমন টিপে টিপে তামাক দেয় যে ধোয়াই বেরোয় না।"

গেরুয়াধারী বললেন, "আমারও ও চাকরি বেশীদিন থাকে নি।"

"কি করতে হত আপনার চাকরিতে—"

"বিশেষ কিছুই নয়। একমাত্র কাজ বই ডেসপ্যাচ করা, অর্থাৎ অর্ডার অনুসারে ভি. পি. করা। আমরা পাঁচ জন ডেসপ্যাচার ছিলাম। একজন মোলার (অর্থাৎ মোল্লা), একজন প্যাটার (অর্থাৎ পাত্র), একজন ডেভিস্ নির্ভেজাল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, চতুর্থটি জন হেনরি আব্লুসের চেয়েও কালো। আর পঞ্চম জন আমি সন্ইয়েল। চেহারায় আমি ওদের তুলনায় কন্দর্প-কান্তি ছিলাম। দিনকতক পরেই একটু মুশকিলে পড়তে হ'ল। আমার একটি মাত্র স্যুট। সেটি থাকত ডেভিসের বাসায়। আপিস থেকে গিয়ে সেটি তার বাসায় খুলে রাখতুম, আবার আপিস যাবার সময় পরে যেতুম। সাদা জিনের স্যুট দু'চার দিনেই ময়লা হয়ে গেল। আমাদের যিনি ওপর-ওলা ছিলেন, তিনি বললেন ওরকম ময়লা স্যুট পরে আসা চলবে না। পরিষ্কার পোশাক পরে আপিসে আসতে হয় এ জ্ঞানটাও কি নেই? মুশকিলে পড়ে গেলাম। কিন্তু বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। বুদ্ধির জোরে এড়িয়ে গেলাম বিপদটা। আমার মাতুলটি ছিলেন শৌখীন লোক। তিনি দু'দিনের বেশী কোন স্যুট ব্যবহার করতেন না। পনরো ষোলটা স্যুট ছিল তাঁর। আজ যেটা ছেড়ে দিলেন মাস খানেকের আগে আর সেটি পরবেন না। মামীমা ছাড়া স্যুটটি নিজের হাতে ইস্ত্রি করে রেখে দিতেন। আমি মামীমাকে বললাম, "মামীমা, কলেজে স্যুট পরে গেলে প্রফেসররা একটু সুনজরে দেখে। মামার ছাড়া স্যুটটা আমাকে পরে যেতে দেবে?"

মামীমা বললেন—"তোর গায়ে কি হবে?"

আমার হাইট প্রায় মামার সমান হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ বেমানান হল না। দেখলুম একটু আধটু ঢিলে হচ্ছে বটে, কিন্তু কাজ চলে যাবে।

মামীমা বললেন—"পরে যা তাহলে। কিন্তু দেখো যেন দাগটাগ লাগিয়ে বা ছিঁড়েটিড়ে এনো না।"

"না, ছিঁড়ব কেন। এসেই আবার ছেড়ে রেখে দেব। তুমি যেন আবার মামার কানে কথাটা তুলে দিও না। মামা শুনলে আর পরতে দেবে না।"

মামীমা হাসিমুখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। কি মিষ্টি হাসি যে ছিল তাঁর। হাসলে মনে হত মুখ চোখের ভিতর থেকে একটা আভা বেরুচ্ছে। বুঝতে দেরি হ'ল না যে মামীমা কথাটা প্রকাশ করবেন না। মামা ঠিক আটটা নাগাদ বেড়িয়ে যেতেন তাঁর চেম্বারে। ঠিক তার পরেই আমি বেরুতাম। আর ফিরতাম মামা ফেরবার আগেই। মামার ফিরতে রাত আটটা ন'টা হয়ে যেত। কিন্তু অতি-লোভে সব মাটি হয়ে গেল। ওখানে ওভার-টাইম খাটলে বেশ রোজগার হ'ত। সুবিধে পেলেই ওভার-টাইম খাটতাম। একদিন কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। ফিরে দেখি মামা রেগে কাঁই হয়ে বসে আছেন। আমার চালচলন দেখে অনেক আগেই তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। বাড়ির কাছেই কলেজ অথচ আমি ন'টার আগেই রোজ তাড়াহুড়ো করে খেয়ে বেড়িয়ে যাই কেন? মামীমাকে বলেছিলাম আমি একজন প্রফেসারের কাছে পড়তে যাই। মামা কলেজে খোঁজ নিলেন, দেখলেন আমি একদিনও কলেজ যাই না। জেরা করতেই সত্যি কথা বলতে হল। মামা কান ধরে একটি চড় মারলেন। তারপর বললেন, এখানে আর থাকতে হবে না। কালই বাড়ি চলে যাও। এখানে থাকলে উচ্ছন্ন যাবে।

আমি মামার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে গেলাম ডেভিসের বাসায়। সব শুনে ডেভিস বললে, "তাতে কি হয়েছে। তুই আমার বাসায় থাক। আমি তো একলা থাকি একটা মেসে। দু'জনে বেশ একসঙ্গে থাকা যাবে। আমার ঘরেই একটা সীট খালি আছে—। একটা খবর কিন্তু তোমায় দিচ্ছি। গ্যাব্রিয়েল গসী তোমার পিছনে লেগেছে।"

গোপাল ঘোষ নামটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে ওই রকম করে নিয়েছিলেন আমাদের বড়বাবু। তিনি ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ ছিলেন। ইনিই আমাকে পরিষ্কার স্যুট পরে আসতে বলেছিলেন কিছুদিন আগে। ডেভিসের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার পিছনে লেগেছে মানে? আমার অপরাধ?

ডেভিস বললে, "ওর ইচ্ছে ছিল ওর গবেট শালাটিকে ঢোকাবে তোমার চাকরিতে। ও আশা করতে পারে নি যে আমি তোকে টপ করে ঢুকিয়ে দেব। ও এখন তোর খুঁত ধরবার তালে আছে। সাবধান থেকো—"

দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। আমরা থাকতাম ঠনঠনের কালী-বাড়ির কাছে একটা মেসে। একদিন সকালে খুব জোরে বৃষ্টি এল। দু'ঘণ্টা এক-নাগাড়ে বৃষ্টি। কালীতলায় জল জমে গেল। ট্রাম বন্ধ। সময়ে আপিসে পৌঁছতে পারলাম না। তার পরদিন যখন গেলাম তখন দেখি আমার টেবিলের উপর লেখা রয়েছে—In view of your irregular attendance your service will be dispensed with. এই irregular কথাটা যেন চড়ের মতো এসে লাগল। সোজা চলে গেলাম ম্যাক্‌ফারসন সাহেবের কাছে। তাকে বললাম, "একদিন বৃষ্টির জন্যে আসতে পারি নি বলে তোমার গসী আমাকে এই নোটিশ দিয়েছে। আমি যে এতদিন পাংচুয়ালি কাজ করেছি, তার কি কোনও recognition নেই? একদিন বৃষ্টির জন্যে আসতে

পারলাম না আর অমনি আমাকে irregular বলে নোটিশ দেওয়া হল। যে আপিসের এরকম ব্যবহার সেখানে আমি চাকরি করি না। Appoint his blessed brother-in-law. গুড্ বাই।

সেই দিনই রেজিগ্‌নেশন দিয়ে চলে গেলাম। ডেভিসকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। তাকে হোটেলে খাওয়ালাম একদিন। তারপর আমার কলকাতার লীলা-খেলা সাঙ্গ হল। অন্য মামাদের কাছে আবার ফিরে এলাম বিহারের সেই শহরে। গিয়ে দেখলাম মামারা আমার জন্যে খুব চিন্তিত, কারণ আমার অনেক আগেই আসবার কথা। জিগ্যেস করলেন, এত দেরি হ'ল কেন? কোথায় ছিলি? বললাম, থিয়েটার দেখছিলাম। কেন জানি না বড় মামা সেইটেকেই যথেষ্ট কারণ বলে গণ্য করে নিলেন। কিছু বললেন না। তার পরদিন বললেন, "এখানকার কলেজে ভর্তি হও গিয়ে আর মন দিয়ে লেখাপড়া কর।" আমি মামাদের বললাম, "আমার পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করে না। আমাকে একটা চাকরি করে দিন।" ছোটমামা বললেন, "বেশ, যতদিন চাকরি না হচ্ছে ততদিন পড়ো। ঘরে বসে কি করবে? চাকরি তো গাছের ফল নয় যে টপ করে পেড়ে দিয়ে দেব।" তাই হল, কলেজেই ভর্তি হলাম। মানে, মামাদের কতকগুলো টাকা জলে পড়ল আবার।"

চুপ করলেন গৈরিকধারী। চুপ করতেই বোঝা গেল ঘরের বাইরে বৃষ্টিতে আর হাওয়ায় যে আলাপ হচ্ছে তা-ও নিতান্ত তুচ্ছ করবার মতো নয়।

গোবর্ধন বললেন, "ঝড় বাদলের শব্দ অনেক শুনেছি। কিন্তু আজকে বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছে। রিম্ রিম্ সোঁ সোঁ ঝর্ঝর বর্ষার অনেক রকম বর্ণনা পড়েছি। কিন্তু এ মনে হচ্ছে দু'হাতে তালি দিয়ে কেউ যেন খিকখিক করে হাসছে। শুনতে পাচ্ছেন?"

"পাচ্ছি। সত্যি হয়তো হাততালি দিয়ে খিকখিক করে হাসছে কেউ। আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন ?"

"আমি ? আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কি মূল্য আছে বলুন। তবে স্বপ্নে আমি একবার ভূত দেখেছিলাম।"

"স্বপ্নে ? স্বপ্নে অবশ্য মৃত লোককে দেখা যায়। সেটাকে ঠিক ভূত-দেখা বলে না। জাগ্রত অবস্থায় যদি মৃত কাউকে দেখা যায় তাহলেই সেটাকে ভূত দেখা বলে—"

গোবর্ধন বললেন, "অনেক দার্শনিকের মতে আমাদের জাগ্রত অবস্থাটাও স্বপ্নের নামান্তর।"

"হ্যাঁ, তা বটে। কাশীর কৌটোর মতো একটা স্বপ্নের ভিতর আর একটা স্বপ্ন থাকে। খোলা ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো কিছুই থাকে না পেঁয়াজের মতো। স্বপ্ন জিনিষটাই আশ্চর্য—।"

বাইরে মেঘ ডেকে উঠল গমগম করে।

মনে হল ভারী গলায় কে যেন হেসে উঠল।

গেরুয়াধারী বললেন—"আমি একবার একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলাম। একটু আগে আপনাকে বলছিলাম, না ?"

"কি রকম স্বপ্ন ?"

"সে খুবই অদ্ভুত স্বপ্ন মশাই। শুনবেন ? এখনও সেকথা ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।"

"বলুন।"

"দ্বিতীয়বার কলেজে যখন ভর্তি হয়েছি তখনই দেখেছিলাম স্বপ্নটা। আমি একটা যেন বিদেহী আত্মা মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার দেহ নেই, কিন্তু মন আছে, কামনা আছে। আমি আকাশে সেই গ্রহদের যেন খুঁজে বেড়াচ্ছি যাঁরা পরজন্মে আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবেন। অনেক খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ টক্‌টকে লাল এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে

দেখতে পেলাম। বুঝলাম ইনিই জবাকুসুম সঙ্কাশ সূর্য। আমি বিদেহী, কথা তো বলতে পারি না, মনে মনেই বলতে লাগলাম, হে দেব, আমার জন্মকুণ্ডলীতে তুমি এমন স্থানে অবস্থান কর যাতে আমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়। সূর্য কিছু বললেন না, একটু মুচকি হেসে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে পূর্বাকাশে দেখলাম চাঁদ উঠছে, গোল রূপোর থালার মতো। ওমা, কাছে গিয়ে দেখি অন্যরকম। রূপোও নয়, থালাও নয়। দিব্যি ফুটফুটে একটি যুবক, শাঁখের মতো রং। নবগ্রহ স্তোত্রে যা পড়েছিলাম ঠিক তাই। ক্ষীরোদার্ণব থেকে উঠেছেন তো, বললে বিশ্বাস করবেন না, গা থেকে ক্ষীর ক্ষীর গন্ধ ছাড়ছিল একটা। সূর্যকে যা বলেছিলাম তাঁকেও তাই বললাম। ইনি গম্ভীর হয়ে রইলেন। মনে হল আমার প্রার্থনা বুঝি শুনতে পান নি। দূরে রোহিনী নক্ষত্র উঠেছিল, সেই দিকেই ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। মঙ্গলের দেখা আর পাই না। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। অনেক বাজে নক্ষত্রকে প্রথমে মঙ্গল বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমার নবগ্রহ স্তোত্র মুখস্থ, বাজে নক্ষত্রকে মঙ্গল বলে ভুল করবার ছেলে আমি নই, খুঁজতে লাগলাম। তারপর দেখতে পেলাম। দেখলাম যেন প্রবাল-রঙের বিরাট একটা বাল্‌ব জ্বলছে, সাধারণ বাল্‌ব নয়, কোটি পাওয়ারের বাল্‌ব। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম ইনিই সেই লোহিতাঙ্গ বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভ ধরণী গর্ভসম্ভূত কুমার। এঁকেও মনে মনে প্রার্থনা জানালাম। কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। দেখতে দেখতে সেই বিরাট বাল্‌ব একটি মনুষ্য মূর্তিতে রূপান্তরিত হল। মনুষ্য মূর্তি বলছি বটে, কিন্তু আসলে তা যেন বিদ্যুতে-তৈরি জ্যোতির্ময় শানিত তরবারি একটি। তারপর দেখলুম কোথা থেকে বিরাট এক ভেড়া এসে হাজির হ'ল। তার গায়ের লোমগুলো যেন আগুনের শিখা, শিং দুটো যেন জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে

তৈরি, চোখের দৃষ্টিতেও হুতাশন। সেই ভেড়া পিঠ পেতে দাঁড়াল, মঙ্গল তার উপর চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন অনন্ত অন্ধকারে। আমিও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম। এরপর বুধকে খোঁজবার পালা। খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু এ-ও বুঝলাম যে ওঁরা নিজে যদি না দেখা দেন দেখা পাব না। আকুল হয়ে খুঁজতে লাগলাম। কতক্ষণ খুঁজেছিলাম জানি না, হঠাৎ দেখলাম শ্যামবর্ণ এক কিশোর আমার সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। গা দিয়ে ফিকে সবুজ জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। —চেহারাটা দুষ্টু দুষ্টু। চোখের তারা অদ্ভুত। কালো নয়, নীল নয়, সবুজ। যেন দুখানি বেদাগ পান্না জ্বলছে। মনে মনে তাঁকে প্রার্থনা জানালাম। তিনি হাত দিয়ে দূর আকাশের একটা জায়গা নির্দেশ করে দিলেন। দেখলাম সে জায়গাটা আলোয় আলো হয়ে গেছে। আলোটা কিসের হতে পারে তা ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। মহাকাশে আলোর উৎস তো অসংখ্য। যেমন আলো, তেমনি অন্ধকার। ওই আলোটা কি তা জিগ্যেস করবার জন্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বুধ চম্পট দিয়েছে। তখন ওই আলোটার দিকেই অগ্রসর হলাম। কিন্তু একটা মুশকিল হল। যতই যাই, ততই যেন সেটা সরে সরে যায়। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই, পথ আর ফুরোয় না। একটা সুবিধে ছিল অবশ্য, দেহ তো ছিল না তাই ক্লান্তি হচ্ছিল না একটুও। বরং জেদ চড়ে যাওয়াতে গতিবেগ হু হু করে বেড়ে যাচ্ছিল। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে সেই আলোর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম লক্ষ লক্ষ যোজন ব্যাপী বিরাট এক আলোক পরিমণ্ডল। তার ভিতরে অনেকে হাত জোড় করে বসে আছেন এক বিরাট জ্যোতির্ময় পুরুষকে কেন্দ্র করে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে চিনতে পারলাম। মার্কামারা চেহারা ওদের। ব্রহ্মা চতুর্মুখ, মহেশ্বর পঞ্চানন আর বিষ্ণু চতুর্ভুজ। তখন বুঝতে পারলাম আর যাঁরা বসে আসেন তাঁরাও দেবতা, আর ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি।

আবক্ষ সাদা দাড়ি, মাথায় ঘন সাদা চুল বাবরির মতো। চোখের দৃষ্টি প্রশান্ত গভীর, এবং সুদূর-প্রসারী। তিনি যে কারও স্তব শুনছেন তা মনে হল না। গায়ের রং ঠিক কাঁচা সোনার মতো। আর তার থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে আলো তা বর্ণনা করবার সাধ্য আমার নেই। আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখতে লাগলাম। তারপর সভয়ে মনে মনে জানালাম—হে দেবগুরু, হে বৃহস্পতি, পরজন্মে আমার জন্মলগ্নে শুভস্থানে অবস্থান করবেন এই প্রার্থনা জানাই। তিনি ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করলেন না। তাঁর দৃষ্টি যেমন সুদূর-প্রসারী ছিল তেমনিই রইল। মনে হল তিনি যেন সমাধিস্থ।"

গোবর্ধন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন—"এই সব আপনি একটানা দেখে গেলেন স্বপ্নে?"

"হ্যাঁ মশাই। দেখলাম। Truth is stranger than fiction."

"তার পর?"

"তারপর বৃহস্পতির এলাকা ছেড়ে চলে গেলাম। খুঁজতে লাগলাম শুক্রকে। বেশী বেগ পেতে হয় নি। একটু পরেই পেলাম তাঁকে। কি রকম দেখতে জানেন? সাহেবের মতো। ধপধপে সাদা রং, কটা চুল, কটা দাড়ি-গোঁফ। লম্বা জোব্বা পরা। হঠাৎ মনে হয় যেন মিশনারি প্রফেসার। আর তাঁর চারদিকে ঘিরে আলোর উৎসব চলছে। রামধনুর সাতটা রং একে একে ফুটছে আলাদা আলাদা, তারপর সব মিলে মিশে হয়ে যাচ্ছে দুধের মতো সাদা আলো। আমার দিকে সকৌতুকে একবার চাইলেন। ভাবটা যেন—কি হে, তুমি এখানে কেন? মনে মনে প্রার্থনা জানালাম, কিন্তু তাঁর মুখের কোন ভাব-পরিবর্তন হ'ল না। আমি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, যদি কিছু বলেন। কিছু বললেন না। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি আবার ঘুরতে লাগলাম। ঘুরতে ঘুরতে শনিরও দেখা পেলাম।

যেন একটা বিরাট গোঁপ-দাড়ি-জটা-ওলা টাওয়ার। টাওয়ারটা যেন নিয়ন-লাইটের বালবের মতো জ্বলছে, নীল আলো বেরুচ্ছে তার থেকে। টাওয়ারের কোমরে পেটে আর বুকে তিনটে বড় বড় রিং—তা-ও নিয়ন-লাইটের। সে তিনটে থেকেও নানা রকম নীল আলো বেরুচ্ছে। বেরুচ্ছে বললে কিছুই বলা হবে না। ছুটে বেরুচ্ছে ফোয়ারার মতো। দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। মনে মনে প্রার্থনাটা জানিয়ে সরে পড়লাম সেখান থেকে। শনিকে চিরকালই ভয় করি। আমার প্রার্থনায় তিনি সাড়া দিলেন কি না তা দেখবার জন্যে সেখানে আর দাঁড়ালাম না। বেগে পলায়ন করলাম। কিছুক্ষণ পরেই থমকে দাঁড়াতে হল। সামনে দেখি বিরাট একটা কালো ফুটবলের মতো কি যেন এগিয়ে আসছে। তার উপর দুটো ভাঁটার মতো চোখ আঙরার মতো জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কি সর্বনাশ—এ যে রাহু। ঠোঁটের উপর একজোড়া মোচার মতো গোঁফ। সমস্ত মুখে একটা তেরিয়া-তেরিয়া ভাব। অনেকটা দুর্গাপ্রতিমার অসুরের মতো দেখতে। সেখানেও বেশীক্ষণ দাঁড়ালাম না। কোনও রকমে প্রার্থনাটা পেশ করে দিলাম চম্পট। বাবাঃ, ওরকম বিরাট মুণ্ডের সামনে দাঁড়ানো যায় কখনও। কেতুর দেখা অনেকক্ষণ পাই নি। অনেকক্ষণ আকুল প্রার্থনার পর তিনি নিজেই আবির্ভূত হলেন আমার সামনে। পোয়াল গাদায় আগুন লাগলে যেমন ধোঁয়া বেরোয় তেমনি ধোঁয়ার মতো তাঁর চেহারা। চোখ মুখ নাক কিচ্ছু নেই। বিরাট ধোঁয়া খানিকটা। প্রার্থনা জানালাম এঁর কাছেও। ইনি উত্তর দিলেন। সেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল। বললেন, রে বিদেহী আত্মা, (আত্মা বললেন না, আৎমা বললেন) তুই বৃথাই ছটফট করে মরছিস। তোর জন্মকুণ্ডলীতে আমরা কে কোথায় থাকব তা তোর জন্মের আগেই ঠিক হয়ে আছে। তোর পূর্ব জীবনের কর্মফলই তা ঠিক করেছে। তা বদলাবার সাধ্য আমাদের কারো নেই, কারণ আমরাও অমোঘ

নিয়মে আবদ্ধ। তোর ভাগ্যনিয়ন্তা তুই নিজেই। তোর ভবিষ্যৎ জন্মকুণ্ডলী দেখবি? ওই দেখ!"

অন্ধকার আকাশপটে আলোর রেখায় আমার জন্মকুণ্ডলীটা আঁকা হয়ে গেল দেখলাম। তারপর সব মিলিয়ে গেল। আমারও ঘুমটা ভেঙে গেল—।"

গোবর্ধন বিস্ফারিত নয়নে শুনছিলেন।

বললেন, "অত্যন্ত অদ্ভুত স্বপ্ন। আপনি যতই লুকোবার চেষ্টা করুন আপনার ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ নিশ্চয়ই আছে। না থাকলে এরকম স্বপ্ন কেউ দেখতে পারে না—।"

"তা হবে। কিন্তু সে সম্পদের উপর এত গরদা জমা হয়েছে যে সেটা ভাল ঠাহর হয় না। ভগবান অবশ্য গরদা সাফ করবার চেষ্টা করছেন যথেষ্ট, ধোপা যেমন করে পাটাতনের উপর কাপড় আছড়ায়, আমাকেও তেমনি তিনি আছড়াচ্ছেন। কিন্তু গরদা যে প্রচুর, সহজে কি সাফ হয়!"

দুজনেই চুপ করে রইলেন। বাইরে ঝড় জলের মাতন তুমুল থেকে তুমুলতর হতে লাগল।

"প্রলয় শুরু হয়ে গেল নাকি—" গেরুয়াধারী বললেন।

"হলেই বা উপায় কি। ওসব ভেবে লাভ নেই। আপনার জীবন-কাহিনীই শোনা যাক। কলেজেই আবার পড়তে লাগলেন?"

"পড়তে লাগলাম বললে ভুল হবে। কলেজে নাম লেখানো রইল। মর্জি মাফিক কখনও যেতুম, কখনও যেতুম না! কোলেদের বাড়িতে আড্ডা দিতুম। থিয়েটারে মেয়ে সাজতুম। ফিমেল পার্ট করে বেশ নাম করেছিলাম। মামারা কিচ্ছু বলতেন না। কারণ শহরের তিনটে ক্লাবেরই তাঁরা পেট্রন ছিলেন। এইভাবেই চলছিল, এমন সময় অদৃশ্য হস্ত অদৃশ্য টিকিটি ধরে আবার টান দিলেন। গোপাল মল্লিকের

চোখে পড়ে গেলাম একদিন। আমার এই চেহারাটার জন্যে অনেক সুবিধা হয়েছে আমার। সেকালে ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে সিনেমা স্টার সংগ্রহের এমন ঢালাও রেওয়াজ ছিল না, থাকলে ওই লাইনেই বাজিমাৎ করতে পারতাম। চেহারাটা সত্যিই ভালো ছিল। যে দেখত মুগ্ধ হয়ে যেত। অভিনয় করে মেডেলও পেয়েছি। হিন্দীতে একটা কথা আছে আগে দর্শনধারী, পিছু গুণ বিচারি। খুব ঠিক কথা। গোপাল মল্লিকের চোখে পড়ে গেলাম আমাদের বাড়ির সামনের গলিটার মোড়ে। সেকালে তুই তোকারি করলেই আত্মীয়তা প্রকাশ করা হত।

বললেন, "তুই কে রে ? তোকে তো দেখিনি কখনও।"

বললাম, "আমি জনকবাবুর ভাগ্নে।"

"কি করছিস ?"

"কলেজে নাম লিখিয়ে চুপ করে বসে আছি বাড়িতে।"

"টাইপ-রাইটিং জানিস ?"

"না।"

"আচ্ছা, আমার আপিসে চলে আয়, একটা খালি টাইপ-রাইটার পড়ে আছে, সেইটেতে হাত মক্‌শ কর।"

অবাক হ'য়ে গেলাম। গোপাল মল্লিক আমার বন্ধু, শেতলার বাবা। তিনি আমাকে রোজ রাস্তায় দেখেন, কিন্তু ভাবটা করলেন যেন আমাকে চেনেন না, জানেন না। যেন রাস্তা থেকে আমাকে কুড়িয়ে নিলেন। এক গোপাল আমার চাকরি খেয়েছিলেন, আর এক গোপাল চাকরি দিলেন। মামারা আপত্তি করলেন না, খুশিই হলেন বরং। গোপাল মল্লিক P. W. D. আপিসের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। হেড্ ক্লার্কদের প্রবল প্রতাপ তখন। আমি যেতেই আমাকে একটা টাইপ-রাইটার দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওইটেতে বসে প্র্যাকটিস্ কর।' আর একজন

টাইপিস্টকে বললেন, 'ওহে ওকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দাও তো। একেবারে মাকাল ফলটি। কিচ্ছু জানে না।' শেখ রহিমুদ্দিন প্রবীণ টাইপিস্ট। তিনি এগিয়ে এসে আমাকে আদাব করলেন। হ্যাঁ মশাই, আদাব করলেন। আমি তাঁর ছেলের বয়সী। এই আদব কায়দাটা মুসলমানদের আছে, কিন্তু বাঙালীদের নেই। বাঙালা ছেলেরা আজকাল গুরুজনদের পর্যন্ত প্রণাম করে না। কেউ কেউ দুহাত তুলে এমন একটা ভাব করে যেন পাঁঠা কাটছে। যাক্, অবান্তর কথায় এসে পড়েছি। শেখ রহিমুদ্দিনের কাছে আমি টাইপ-রাইটিংয়ে প্রথম পাঠ নিলাম। আপিসে বসে সমস্ত দিন প্র্যাকটিস্ করতাম। শহরে একটা শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং শেখবার স্কুল ছিল। সেখানে রাত্রেও পড়ানো হত। ভর্তি হ'য়ে গেলাম সেখানে এবং ক্রমাগত প্র্যাকটিস্ করতে লাগলাম। একমাসের মধ্যে আমার স্পীড ফিফ্‌টি ওয়ার্ডস্ পার মিনিট হল। ওই স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হলাম। তখন All Indian Remington Typewriter কম্পিটিশন হত। সে পরীক্ষাটাও দিয়ে ফেললাম কলকাতায় গিয়ে। তাতেও ফার্স্ট হয়ে গোল্‌ড্ মেডেল পেলাম। তখন আমার স্পীড সেভেন্‌টি ওয়ার্ডস্ পার মিনিট। একেবারে নির্ভুল। হবেই তো, আপিসে তো আর কোন কাজ ছিল না, কেবল বসে বসে প্র্যাকটিস্ করতাম। এইবার এক বাঙালী মহাপ্রভুর টনক নড়ল। তাঁর ন্যায়-বুদ্ধি জাগরিত হল। আমার মতো আনাড়ি যে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে মাইনে নিয়ে আপিসে বসে টাইপরাইটিং শিখছে বড়বাবুর কৃপায়, এ অন্যায় তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। ওই আপিসেরই অন্য ডিপার্টমেণ্টের কেরানী ছিলেন তিনি। সাহেবকে কানে কানে গিয়ে লাগালেন—হেড ক্লার্ক ওই যে লাল টুকটুকে ছেলেটিকে বাহাল করেছে ও একটি গবেট। টাইপ করতে পারে না, আপিসে বসে প্র্যাকটিস্ করে খালি। প্রথম

প্রথম আমি তাই করতুম বটে কিন্তু পরে যে আমি দিনরাত খেটেখুটে expert হয়ে গেছি এ খবর রাখতেন না বাছাধন। ফলও পেলেন। তার কথা শুনে সাহেব হঠাৎ একদিন টাইপ-রুমে এলেন সারপ্রাইজ চেক করতে। আমাকে একটা লম্বা রিপোর্ট দিয়ে বললেন, এটা এখুনি টাইপ করে নিয়ে এস। আমার তখন সেভেনটি ওয়ার্ডস্ পার মিনিট স্পীড। সঙ্গে সঙ্গে নির্ভুল টাইপ করে নিয়ে গেলাম। সাহেব আমার উপর মহা খুশি হলেন। যে বঙ্গসন্তানটি আমার নামে গোপনে নালিশ করেছিল তার কি হ'ল জানেন? একজন ভালো লোকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনার জন্যে সাহেব তার বিরুদ্ধে proceedings ড্র করলেন। চাকরি যায় যায়। আমার পায়ে কেঁদে পড়ল সে তখন! আমি আমার পেট্রন গোপাল মল্লিককে গিয়ে বললাম। তিনি যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

"ও, তাই নাকি! বেশ, সাহেবকে বলতে পারি, ও যদি সবার সামনে তোমার কাছে ক্ষমা চায়।"

চাইতে হল। গোপালবাবু গিয়ে সাহেবকে বলাতে চাকরিটা রয়ে গেল তার।

সায়েব আমার কাজ দেখে এত খুশি হয়েছিলেন যে আমাকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে কনফিডেনশাল্ সেক্শনের সব কাজ করতে দিতেন। আমার মাইনেও বাড়িয়ে দিলেন। গভর্ণমেন্ট থেকে মাসে ৩৫৲ করে পেতাম, আর সাহেব নিজের পকেট থেকে ৩৫৲ দিতেন তাঁর নিজের কনফিডেনশাল কাজ করাতেন বলে। তখন আমার শনি তুঙ্গী চলছে, শনি আমার ভাগ্যাধিপতি, তখন আমায় আটকায় কে। আয় আরও বাড়ল। প্রাইভেট যে স্কুলটার কথা বলেছিলাম তার প্রিন্সিপাল মামার খুব বন্ধু ছিলেন। তিনিও আমাকে তাঁর নিজের ও স্কুলের কাজ করবার জন্যে বাহাল করলেন। পঞ্চাশ টাকা

করে মাইনে দিতেন। রাত জেগে তাঁর কাজ করতুম। দেবতুল্য লোক ছিলেন। ক্রিশ্চান, কিন্তু দেবতুল্য।"

হঠাৎ থেমে গেলেন গেরুয়াধারী।

"ও মশায়, আলোটা একবার জ্বালাতে পারেন?"

"দেশলাই তো নেই। ভজুয়ার বউ ফিরেছে কিনা সন্দেহ। আলো জ্বালতে চাইছেন কেন?"

"গুরুতর কারণ আছে। আমার পায়ের উপর দিয়ে খুব ঠাণ্ডা দড়ির মতো খরখরে কি একটা চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কদ্রুর বংশধর কেউ—।"

"কদ্রু? মানে, লাউ?"

"আরে না না, সাপ। মহাভারতও পড়েন নি।"

"আজ্ঞে না, ওটা তো কোর্সে ছিল না। সাপ? বলেন কি!"

"চেঁচামেচি করবেন না। চুপ ক'রে থাকুন, ও আপনিই চলে যাবে। আমার পা-টা তো পার হয়ে গেল। আপনি আলোটা জ্বালবার চেষ্টা করুন। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

"আচ্ছা, দেখছি। বেশ বৃষ্টি পড়ছে। ভজুয়ার বউয়ের শাড়িটা ভিজে সপ্ সপ্ করছে।"

"নিংড়ে নিন না।"

"তাই নি।"

গোবর্ধন কাপড় নিংড়াতে নিংড়োতে বললেন, "অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু খুব সম্ভবত আলকাতরার মতো কালো জল বেরুচ্ছে কাপড়টা থেকে। যা দুর্গন্ধ—।"

তবু ওই গায়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়লেন গোবর্ধন।

গেরুয়াধারী একা বসে ঝড়বৃষ্টির গর্জন আর সাপের সান্নিধ্য উপভোগ করতে লাগলেন। প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল, গোবর্ধন ফিরলেন না। গেরুয়াধারীর মনে দার্শনিক ভাবের আমেজ এল একটা। তিনি ভাবতে লাগলেন এক নতুন ধরনের মজার মধ্যে ফেলেছেন তাঁকে ভাগ্যবিধাতা। তাঁর জীবনে অনেক রকম মজার আয়োজন করেছেন তিনি ইতিপূর্বে। সবগুলোই তিনি উপভোগ করেছেন, এমন কি তাঁর ছেলের মৃত্যুটাও। আজকের এই অবস্থাতেই বা ঘাবড়াবেন কেন? এটাকেও তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে হবে। হঠাৎ তাঁর গোবর্ধনের জন্য চিন্তা হ'ল। এখনও আসছে না কেন? এই অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটিকে ভালো লেগে গিয়েছিল। বেশ লোকটি। সারাজীবন চাকরির চেষ্টা করছে, অথচ কোথাও লাগছে না। তারপর একটা কথা মনে হওয়াতে নিজেরই আশ্চর্য লাগল। লোকটি যদি সব দিক দিয়ে কৃতী হ'ত তাহলে হয়তো ওকে অত ভাল লাগত না। কৃতী হলে লোকের ভালবাসা পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধা অনেক সময় পাওয়া যায়, তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌখিক কিংবা স্বার্থদুষ্ট। তার মেজমামার একটা কথাও মনে পড়ল। মেজমামার দুই ছেলে। একটি বেশ কৃতী। কম্‌পিট করে বড় চাকরি পেয়েছে। বড় বড় শহরে থাকে। আর ছোট ছেলেটি ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে নি। সে মেজমামার কাছে থাকত। শেষ বয়সে মেজমামার পক্ষাঘাত হয়েছিল। ওই ছোট ছেলেই সেবা করত তাঁর। ওই পিন্টু কাছে না থাকলে অশেষ দুর্গতি হ'ত মেজমামার। পিন্টুর দাদা তখন লাহোরে। সেখানে মেজমামাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মেজমামা তাই জড়িয়ে জড়িয়ে প্রায়ই বলতেন—বাবা পিন্টু, ভাগ্যে তুই ম্যাট্রিক পাশ করতে পারিস নি, তাই বুড়ো বয়সে তোকে কাছে পেয়েছি। শন্টুর মতো ভালো ছেলে হ'লে অমনি দুর্গতি হ'ত

আমার। গেরুয়াধারীর মনে হচ্ছিল যারা জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে নি, তারাও অধন্য নয়। তারা অনেকের ভালবাসা পায়।

…বাইরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। তারপর গোবর্ধন এলেন। সঙ্গে দুজন লোক নিয়ে। একজনের হাতে লণ্ঠন আর লাঠি। আর একজনের হাতে বালতি একটা।

"ভজুয়ার বউ এখনও ফেরেনি। তাই আমি মাঠ পেরিয়ে মাইল খানেক দূরে গ্রামটার ভিতর চলে গিয়েছিলাম। যখন শিকারে এসেছিলাম তখন এখানকার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনিও খুব ভাল শিকারী। গেলাম তাঁর বাড়িতে। কিন্তু বরাত খারাপ, শুনলাম তিনি কলকাতা গেছেন। খুঁজে বার করলাম তাঁর কম্পাউণ্ডারকে। সব শুনে তিনি বললেন, "বালতি করে স্ট্রং কার্বলিক লোশন নিয়ে যান। সেইটে ঘরের চারিদিকে ছিটিয়ে দিলে সাপ পালাবে। সঙ্গে দু'জন লোক দিলেন, লাঠি আর লণ্ঠনও দিলেন। সাপটাকে যদি দেখা যায় মারা যাবে। লোকটি প্রকৃতই সজ্জন। আমাদের বিপদ শুনে নিজেই আসতেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর প্রসব-বেদনা উঠেছে বলে আসতে পারলেন না। ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।"

যে লোক দুজন এসেছিল তাদের মধ্যে একজন বললে—"ও, এইখানে সাপ বেরিয়েছিল? তা তো বেরোবেই। পীরবাবার সাপ। ও সাপকে আমরা মারতে পারব না। আপনারা নির্ভয়ে বসে থাকুন। ও সাপ কাউকে কিছু বলবে না। দাবাইটা ছিটিয়ে দিন ভাল করে।"

দেখা গেল চালের অনেক জায়গা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। গেরুয়াধারীর গেরুয়া ঝুলিটি ভিজেছে। তিনি সেটি তাড়াতাড়ি নিজের কোলের উপর টেনে নিলেন। বললেন, "দরকারি চিঠি আছে এতে একটা। সেটা ভিজে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে।"

ঘরের মেজে বেশ ভিজেই গিয়েছিল। কার্বলিক লোশন ছেটানোতে আরও ভিজে গেল সব। মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধের বদলে কার্বলিক এসিডের গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল চারিদিক।

গেরুয়াধারী প্রশ্ন করলেন, "এখানে পীরবাবার সাপ এল কি করে?"

লোকটি বলল, "আপনারা যে পীরবাবার কবরের উপরই বসে আছেন। ওই যে পাকা দেওয়ালটা দেখছেন ওটা কবরের একটা অংশ। কবরের বাকি অংশটা ধসে গেছে বহুকাল আগে। ভজুয়া ওই পাকা দেওয়ালটা কাজে লাগিয়েছে। এ অঞ্চলের মুসলমানেরা এতে অসন্তুষ্ট। কোনদিন হয় তো দাঙ্গা বেধে যাবে।"

একটু থেমে লোক দুটি বলল, "লাঠিটা আপনারা রাখতে চান তো রেখে দিন। লণ্ঠনটা কিন্তু আমাদের নিয়ে যেতে হবে। বালতিটাও।

লণ্ঠন এবং বালতি নিয়ে তারা চলে গেল।

গোবর্ধন স্বস্থানে বসলেন এবং বললেন, "অনেক আগে এ ঘাটটার নামই ছিল নাকি পীরবাবার ঘাট। এক গোঁড়া হিন্দু ক্ষত্রিয় পঞ্চাশ বছর আগে এ অঞ্চলের সব জমিদারি কিনেছিল। সে-ই এই ঘাটের নাম বদল করে দিয়েছিল, নাম রেখেছিল সিংজির ঘাট। এ পীরবাবা খুব জাগ্রত শুনলাম।"

"এত সব খবর কে দিলে আপনাকে—"

"এই লোক দুটি। ওরা এ অঞ্চলে পুরুষানুক্রমে আছে। অনেক খবর জানে।"

"ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

গোবর্ধন চোখ বুজে বসে রইলেন খানিকক্ষণ।

তারপর হাতজুড়ে প্রণাম করলেন।

"ওটা কি হল"—জিগ্যেস করলেন গেরুয়াধারী।

"পীরবাবার কাছে একটা মানত করলাম। দেখি তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন কি না।"

"কিসের মানত ?"

"কিসের আবার, চাকরির। তবে ওই সৌদামিনীর ব্যাপার নয়, অন্য একটা। কোলকাতায় আমাদের বাড়ির কাছেই একটা ভাল ব্যাঙ্কে কেশিয়ারের চাকরি খালি আছে একটা। কর্তৃপক্ষ আমাকে জানিয়েছেন যে হাজার দশেক টাকা জমা রাখতে হবে ব্যাঙ্কে সিকিউরিটি স্বরূপ। বাবার ব্যাঙ্কব্যালান্স একদম নীল না হলেও নীলচে। দেখি, পীরবাবা যদি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। টাকা দিতে পারলে ওরা আমাকে রাখবে।"

"ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাইরের অবিশ্রান্ত বর্ষণ যেন একটু কমেছে।

গোবর্ধন বললেন, "থামলেন কেন ? বলুন আপনার জীবন-কাহিনী। বেশ লাগছিল।"

"ভাল লাগছিল ?"

"খুব।"

"আমি সেই P. W. D. আপিসেই চাকরি করতে লাগলাম। সাহেবের খুব প্রিয়পাত্রও হলাম। চাকরি-জীবনে ওইটেই তো লক্ষ্য, আর ওটা হতে পারলেই মোক্ষ। সাহেব খুব ভালবাসতে লাগল আমাকে। এই ভাবেই চলছিল। এমন সময় হঠাৎ সার্চ-লাইটে একদিন দেখলাম এক বিজ্ঞাপন। গভর্ণমেণ্ট হাউস পাটনায় এক টাইপিস্টের পোস্ট খালি আছে। মাইনে ৫০৲ থেকে শুরু। আমি P. W. D. থেকে পাচ্ছিলাম ৩৫৲ আর সাহেব আমাকে নিজের পকেট থেকে দিত ৩৫৲। কিন্তু এ ৩৫৲ টাকা তো ফাউ, অনিশ্চিত, যে কোন দিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সাহেবকে দেখালাম বিজ্ঞাপনটা। সাহেব

বললেন, দরখাস্ত কর। দরখাস্ত তিনি জোর কলমে রেকমেণ্ড করে দিলেন। দিন তিনেক পরে জবাব এল বাই ওয়্যারে। Meet Private Secretary to His Excellency। তখন ব্রেট সাহেব প্রাইভেট সেক্রেটারি। ইণ্টারভিউ করবার জন্যে ডেকেছে। টেলিগ্রাম নিয়ে চলে গেলাম বড় সাহেব এক্‌জিকিউটিভ এনজিনিয়ারের কাছে। তিনি বললেন, 'খুব ভালো হয়েছে, তুমি আজই চলে যাও।' আমি একটু মুশকিলে পড়ে গেলাম। একটু ইতস্ততঃ করে সাহেবকে অবশেষে বললাম, "—সার, আমি আমার বাড়িতে ডিপেন্‌ডেন্টের মতো থাকি। পাটনায় যাওয়ার মতো আমার টাকা, পোশাক, বিছানা, মশারি এসব কিছুই তো নেই। এখন শীতকাল। How shall I go to the Government House like a begger ?"

সাহেব—(মনে রাখবেন সাহেব)—সাহেব আমাকে বললেন, 'সব ঠিক করে দিচ্ছি। সাতদিনের ছুটি দিচ্ছি তোমাকে। পঁচিশটা টাকাও দিচ্ছি। একটা 'রাগ্' দিচ্ছি, আর এই ছোট্ট হ্যাণ্ডব্যাগটাও নিয়ে যাও। উইশ্ ইউ গুড্ লাক। তোমার যা পোশাক আছে ওতেই চলবে।' ঠিক যেন বাবা ছেলেকে বিদেশে পাঠাচ্ছে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছিল আমার। ···যে ট্রেনটায় পাটনা গেলাম সেটা তখন পাটনায় পৌঁছত ভোর চারটেয়। পাঞ্জাব মেল। আমি যে টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম তাতে লেখা ছিল দশটায় দেখা করতে। আমি স্টেশনে একটু চা জলখাবার খেয়ে সোজা গভর্ণমেণ্ট হাউসেই চলে গেলাম। সেখানে দেখা হ'ল চ্যাটার্জি মশায়ের সঙ্গে। তিনি হচ্ছেন শালার শালা, অর্থাৎ হেড্ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট টু প্রাইভেট সেক্রেটারি। তাঁকে টেলিগ্রাম দেখালাম, তিনি বাঙালী, আমিও বাঙালী, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন ইংরেজিতে চিবিয়ে চিবিয়ে। বললেন, 'গো ব্যাক্, দি পোস্ট ইজ্ ফিল্‌ড আপ।' আমি বললাম, 'প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা

করব।' তিনি বললেন, 'হবে না।' আমি সবিনয়ে কেঁচোটি হয়ে বললাম, 'দয়া করে যদি একবার দেখাটা করিয়ে দেন—।' ক্ষেপে গেলেন চ্যাটার্জি মশাই। তাঁর বিলিতি স্যুটের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল এক ছোটোলোক চাষা। অভদ্র ভাষায় গালাগালি দিয়ে বললেন, 'গেট্ আউট্, গেট্ আউট্ ফ্রম্ মাই অফিস্।' আপিস থেকে বেরিয়ে এলাম, কিন্তু আমার রোখ চড়ে গেল যেমন করে হোক ব্রেট্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করবই। সাহেবের আপিসের সিঁড়ি দিয়ে যে-ই উঠতে যাব অমনি প্লেন ড্রেসের এক সাহেব কনেস্টবল এসে বাধা দিলে। বললে, 'পাশ কই, বিনা পাশে ওপরে ওঠা মানা।' আমি তাকে টেলিগ্রামটা দেখালাম। তখন সে নরম হ'ল। বলল, 'ও আই সি, কাম উইথ্ মি।' তিনি উপরে গিয়ে সার্জেন্ট মেজর গড্‌ফ্রের হাতে আমাকে সঁপে দিলেন। গড্‌ফ্রে আমাকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিলেন ব্রেটের দরজা পর্যন্ত। ভারি পরদা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। সেলাম করে সাহেবের দিকে টেলিগ্রামটা বাড়িয়ে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে চটে আগুন হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, 'মিস্টার চ্যাটার্জি কি তোমাকে বলে নি যে পোস্ট ফিল্ড্ আপ্ হয়ে গেছে? তবে আবার এসেছ কেন?' বললাম, 'আপনার ওয়্যার পেয়েই এসেছি সার। আমি অত্যন্ত গরীব মানুষ। আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে আমার যা কিছু জমানো টাকা ছিল খরচ করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি as ordered by you. এখন আমার ফিরে যাবার ভাড়া পর্যন্ত নেই।' সাহেবের মুখে একটা পাইপ ঝুলছিল, সেটা খাড়া হয়ে উঠল! বুঝলাম সাহেব সেটা কামড়ে ধরেছেন। সেই অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে যে শব্দটি নিঃসৃত হ'ল সেটি একটি হুঙ্কার। হতাশ হয়ে কি করব ভাবছি এমন সময় আর একটি সাহেব ঢুকল তাঁর ঘরে। গায়ে ঢিলে-ঢালা পোশাক, চলার ভঙ্গী অনেকটা নাচের মতো। খাঁটি সাহেব, ও রকম নীল চোখ আর কারও

দেখি নি। মনে হ'ল শরতের নীল আকাশের দু'টি ছোট ছোট টুকরো কে যেন বসিয়ে দিয়েছে চোখের মধ্যে। তার আর একটা বিশেষত্ব চোখে পড়ল—বেল্ট্ থেকে তলোয়ার ঝুলছে। ব্রেট সাহেবকে কি বলে ব্রেট সাহেবের শেল্ফ থেকে কি একখানা বই নিল। আবার লক্ষ্য করলাম চলাটাতে চমৎকার নাচের ছন্দ আছে। পরে জেনেছি ভাল Waltz নাচতে পারত। হঠাৎ তার নজর পড়ল আমার দিকে। এগিয়ে এসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিগ্যেস করল—What do you want, my son ? 'Son' শুনে ঘাবড়ে গেলাম আমি। তার পর সব কথা বললাম তাকে। ব্রেটের দিকে ফিরে দেখি সে ঘসঘস করে কি লিখে যাচ্ছে। আমার কথা শেষ হতেই সে মুখ তুলে বললে—What he says is true. তখন ওই সাহেবটি আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে ইংরেজিতে যা বলল তা বঙ্কিমবাবু অনেক আগে তাঁর একটা বইতে লিখে গেছেন।

"কি—"

"মামনুসর। Follow me."

গেলাম পিছু পিছু। লোকটা গভর্ণরের A. D. C. ঘরে ঢুকে তো আমি অবাক। মনে হ'ল যেন ইন্দ্রপুরীর একটা কক্ষে ঢুকেছি। সুন্দর কার্পেট পাতা, ভুরভুর করছে ফুলের গন্ধ, পুরু-গদি-আঁটা ড্রইংরুম স্যুট, দামী দামী চেয়ার চারদিকে। ঘরের মাঝখানে চমৎকার একটি সেক্রেটেরিয়েট টেব্ল আর তার উপর নানান সব জিনিস সাজানো। আবুহোসেনের যে রকম অবস্থা হয়েছিল, আমারও অনেকটা সেইরকম হলো। 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন সাহেব আমাকে চেয়ারে বসতে বলল। সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সামনে যে গদি-আঁটা চেয়ারটা ছিল সেইটে দেখিয়ে বলল, 'Sit down and take dictation.' বসলাম। বললাম, 'May I take your pen and paper sir ?'

'ইয়েস, ইয়েস'।

সাহেব ডিক্‌টেশন দিলেন। লিখলাম, বেশ স্পষ্ট আওয়াজ। বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হ'ল না। তারপর বললেন, 'বেশ ধরে ধরে মন থেকে বানিয়ে কিছু লেখ। তোমার হাতের লেখা কি রকম দেখব।' তৎক্ষণাৎ লিখলাম—'My handwriting is very bad. But my teacher says it is good. You Sire, now judge'। সাহেব পড়ে হেসেই আকুল। তারপর পাশের ঘর থেকে ব্রেটকে ও আর একটি সাহেবকে ডাকলেন। বলতে ভুলেছি লর্ড সিন্‌হা তখন বিহারের গভর্ণর। এই দ্বিতীয় সাহেবটিকে লর্ড সিন্‌হা বিলাত থেকে আসবার সময় অ্যাডিশনাল প্রাইভেট সেক্রেটারি করে নিয়ে এসেছিলেন। মিস্টার প্যাট্রিক এঁর নাম। আর যে সাহেবটি আমাকে ডেকে ডিক্‌টেশন দিলেন তাঁর নাম ক্যাপটেন হ্যাসকেট্‌ স্মিথ। লর্ড ডাফ্‌রিনের খাস ভাগ্নে। এঁদের নাম আর পরিচয় পরে জেনেছিলাম। হ্যাস্‌কেট, ব্রেট আর প্যাট্রিককে ডেকে আমার লেখা দেখাতে লাগল আর ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা কইতে লাগল। আমি একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। একটু পরেই ব্রেট আর প্যাট্রিক চলে গেল। তখন হ্যাস্‌কেট্‌ আমার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললেন, 'বেশ, আমি তোমাকে বাহাল করলাম। মাইনে কত চাও?' বললাম, 'আমি যে পোস্টের জন্য এসেছিলাম সেটার মাইনে ৫০৲ আর আমার আগেকার পোস্টে পাচ্ছিলাম ৩৫৲। দুটোতে যোগ করে পঁচাশি হয়। আশি টাকা পেলেই আমি খুব খুশি হব।' সাহেব বললেন, 'অল রাইট।' কিন্তু appointment letter তখন দিলে না। বললে, 'তোমাকে আজ থেকেই বাহাল করছি। কিন্তু গভর্ণর হাউসের চাকরিতে এসব জামা কাপড় চলবে না। গভর্ণমেণ্ট হাউসের মর্যাদার সঙ্গে তাল রেখে পোশাক পরিচ্ছদ পরতে হবে।' আমি বললাম, 'আপত্তি নেই। কিন্তু আমি যে বড্ড গরীব। দামী পোশাক কেনবার পয়সা কোথায় পাব।' বললে বিশ্বাস করবেন না, সাহেব তৎক্ষণাৎ আমাকে

৩০০৲ টাকার একটা ড্রাফ্‌ট্‌ লিখে দিলেন। বললেন, করিয়ে নাও সব। আমি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ড্রাফ্‌ট্‌ আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নাও, এ টাকা তোমায় শোধ করতে হবে না।' আমি তখন বললাম, 'কোথায় কিনতে হবে, কিরকম জিনিস মানানসই হবে, আমি তো ঠিক জানি না।' সাহেব বললেন, 'ওয়েট্‌ এ বিট'। ফোন করলেন উড্‌ল্যাণ্ড বলে কোন সাহেবকে। বললেন তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে দিতে। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'কাম'। আমি তাঁর পিছু পিছু নেমে গেলাম। গিয়ে দেখি পোর্টিকোতে বিরাট উল্‌সে কার দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আমাকে নিয়ে সেই গাড়িতে উঠে বসলেন। নিয়ে গেলেন আমাকে পাটনার একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের দোকানে। তার দোকানেই তখন পাটনার সাহেবরা আর রইসরা কাপড় কিনতেন। সেই দোকানে গিয়ে হ্যাস্‌কেট্‌ সাহেব আমার জন্যে সান্‌প্রুফ্‌ সোলারো তিন পিস্‌ স্যুট কিনলেন। তখনকার দিনে ১৮৲ গজ ছিল। তারপর কিনলেন গ্রে ফ্ল্যানেলের আর একটি স্যুট। এ ছাড়া ব্লু ব্লেজার স্যুটের অর্ডার দিলেন একটি। বললেন সাতদিনের মধ্যে চাই, গভর্ণমেণ্ট হাউসে। তারপর নিয়ে গেলেন চান্‌লিনের কাছে। চান্‌লিন তখনকার দিনের নামজাদা চীনে জুতো-ওলা। সেখানে একজোড়া পেটেণ্ট লেদারের শু, এক জোড়া বেস্ট ব্রাউন ব্রোগ্‌ শু, আর কার্পেটের উপর চলবার জন্য এক জোড়া মোলায়েম চটি অর্ডার দিলেন। তারপর নিয়ে গেলেন আর একটা দোকানে। সেখানে কিনে দিলেন ড্রেসিং গ্লাউন, শ্লীপিং গাউন, বেঁটে বেঁটে কোট, কালো টাই, লং কোট সাদা টাই, ডবল-breasted সাদা কামিজ, এক ডজন নানারঙের মোজা। মানে, আমাকে একটি মিনিয়েচার গভর্ণমেণ্ট-হাউস গেস্ট বানিয়ে ছাড়লেন। আমি হতবাক্‌, চেয়ে চেয়ে দেখলুম সাহেব নিজের চেক বই থেকে কচাকচ চেক কাটছেন। সবসুদ্ধ ৯০০৲ টাকা লাগল। আমি

মনে মনে ভাবছি আমার ৮০্ টাকা মাইনে থেকে এসব শোধ হবে না কি! তাহলেই তো গেছি! লোকটা বোধ হয় অন্তর্যামী ছিল। আমার দিকে ফিরে বলল—'এ সবের দাম তোমাকে দিতে হবে না। তোমাকে সাতদিনের ছুটি দিচ্ছি। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে এস।' নিজে আমাকে স্টেশনে নিয়ে গেলেন, কেলনারে খাওয়ালেন, তারপর ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কেটে দিলেন একটা। চিন্তা করুন ব্যাপারটা। কোনও বাঙালীকে পরের জন্য এরকম করতে দেখেছেন?

কুণ্ঠিত কণ্ঠে গোবর্ধন বললেন, "দেখেছি বই কি! ডক্‌টর বিধুভূষণ রায় সায়েন্স কলেজে ফিজিক্‌সের প্রফেসার ছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি তাঁর জার্মানি যাওয়ার আগে আশু মুকুজ্যে তাঁকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে স্যুটের কাপড়-চোপড়, হোল্‌ডল স্যুটকেস—সব কিনে দিয়েছিলেন। হরেন মুকুজ্যের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমি ঋণী। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তো তাঁর সব উপার্জন পরকেই দিতেন—।"

যে গোবর্ধন কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন বাঙালীই বাঙালীর শত্রু এখন তাঁর গলা আবেগভরে কাঁপতে লাগল।

গেরুয়াধারী বললেন, "ওঁরা তো মহাপ্রাণ দেবতা। ওঁদের কথাই আলাদা। আমি সাধারণ বাঙালীর কথা বলছি। ওই যে মিস্টার চ্যাটার্জি, যে আমাকে অভদ্রের মতো দূর্ দূর্ করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল, সে তার ভাইপোটিকে কায়দা করে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ওই ব্রেট সাহেবের আপিসে টাইপিস্ট করে। ব্রেট সাহেব বলেছিলেন আমাকে খবর দিয়ে দিতে। কিন্তু দেয় নি। কিন্তু মিস্টার চ্যাটার্জি ফ্যাটার্জির সাধ্য কি আমার গতি রোধ করে? আমার ভাগ্যদেবতা তখন প্রসন্ন হয়েছে, আমাকে রুখবে কে? ও ব্যাটা চাষার মতো ব্যবহার করে শুধু আত্মপরিচয়টা দিলে—।"

হেসে উঠলেন গোবর্ধন।

"ঠিক বলেছেন। শান্তিনিকেতনের ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম, সেইটে মনে পড়ল আপনার কথা শুনে।"

"কি গল্প— ?"

"তাঁদের গ্রামে তাঁদের প্রতিবেশী একজন মুসলমানের মেয়ে হঠাৎ বিধবা হ'ল। ক্ষিতিমোহন বাবুদের মনে হ'ল প্রতিবেশীর এমন বিপদে সমবেদনা প্রকাশ করতে যাওয়া উচিত। তিনি এবং তাঁদের বাড়ির আরও দুএকটি ছেলে সন্ধ্যার পর সন্তর্পণে হাজির হলেন তাদের বাড়ির উঠোনে। যাওয়া মাত্রই তাঁরা শুনতে পেলেন মেয়ের বাবা বলছেন— আল্লা, এডা তুমি কি করল্যা! এ কি হেঁদুর মাইয়া পাইছ? আমি তো আমার ফতিমার আবার বিয়া দিমু। তুমি শুধু তোমার মুখডা চিনাইল্যা। আপনার চ্যাটার্জি মশাইও তাঁর মুখটা চেনালেন কেবল— ।"

হা হা করে হেসে উঠলেন গেরুয়াধারী। তারপর হঠাৎ থেমে গেলেন।

বাইরে ঝপ্ ঝপ্ করে শব্দ হচ্ছিল একটা।

"কিসের শব্দ ওটা বলুন তো ?"

গোবর্ধন বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন আবার।

"গতিক খুব খারাপ মনে হচ্ছে। গঙ্গার পাড় ভেঙে ভেঙে পড়ছে।"

"ভজুয়ারা কেউ আসে নি ?"

"তাতো জানি না। ওদিকে তো যাই নি।"

"ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে একটু। এমন বিপদে পড়ব কে জানত। খাবার আনতুম তাহলে সঙ্গে করে। আপনার সঙ্গেও বোধ হয় কিছু নেই ?"

"না। তবে ভজুয়ার বৌয়ের কানে যখন উঠেছে কথাটা তখন সে যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা করবেই। আপনি ততক্ষণ জীবন-কাহিনীই শোনান।"

"তাছাড়া কি আর করবার আছে এখন। বসুন, আবার শুরু করি তাহলে। ভালো লাগছে তো ?"

"খুব। অদ্ভুত ঘটনাবহুল আপনার জীবন। পাটনা থেকে তো বাড়ি চলে গেলেন। তারপর ?"

"সাতদিন পরে ফের পাটনায় গেলাম। এবার বেশ জমিয়ে বসলাম গভর্ণরের প্রাসাদে। এসেই বেশ সুসজ্জিত Suitc পেলাম আমার নিজের জন্য। শোবার ঘর, বসবার ঘর, স্নানের ঘর। চক্‌চক্ ঝক্‌ঝক্ করছে। আমার পাশেই রয়েছেন মিস্টার এণ্ড মিসেস্ হ্যানকক্‌স। বিলেত থেকে আসবার সময় লর্ড সিন্‌হা এঁদেরও নিয়ে এসেছিলেন হাউস-হোল্‌ড্ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট করে। আমার থাকা ফ্রি, খাওয়াও ফ্রি। যে খাবার লর্ড সিন্‌হার ফ্যামিলি, তাঁর অতিথিবর্গ এবং স্টাফরা (staff) খেতেন আমিও তাই খেতে লাগলাম। কারণ আমিও স্টাফের একজন হয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। আমার আলাদা চাকরও ছিল একজন, একটা 'বয়'। আরও সুবিধা পেলাম অনেক। ফ্রি ওয়াশ্ (wash), ফ্রি মোটরকারের ইউস্ (use) ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ সব তো পেলাম। কিন্তু কোন কাজ নেই। সেজেগুজে টিপ্‌টপ হয়ে আপিসের চেয়ারে বসা আর ম্যাগাজিনের পাতা-ওলটানো। দিন সাতেক এইভাবে কাটল। আমাকে যে কি কাজ করতে হবে তা-ও বুঝতে পারছি না। খাঁচার পাখিদের যে কি কষ্ট তা সেই ক'দিনে অনুভব করেছিলাম। দিন সাতেক এইভাবে কোনক্রমে কাটালাম। তারপর আর পেরে উঠলাম না। এ. ডি. সি. সাহেবকে গিয়ে বললাম, আমাকে কাজ দাও, তা না হলে আমি পাগল হয়ে যাব যে। সাহেব তখন আমার হাতে appointment letterটি দিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ফ্রেঞ্চ জানো ?' রিপ্লাই নেগেটিভ। সাহেব তখন বললেন, 'ফ্রেঞ্চ শিখতে হবে। বই আনিয়ে দিচ্ছি।' একটি 'ক্যাসেল্‌স্ ফ্রেঞ্চ টু ইংলিশ'

ডিক্‌শনারি আনিয়ে দিয়ে বললেন, 'গেট্ দি হাউস মেন্যু।' গভর্ণমেণ্ট হাউসের মেন্যুটা নিয়ে এলাম। তাতে যে ফ্রেঞ্চ নামের ডিশগুলো ছিল সেইগুলোতে দাগ দিয়ে বললেন, 'এগুলো মুখস্থ করে ফেল। আর ডিক্‌শনারি থেকে এদের মানে আর ঠিক উচ্চারণগুলো জেনে নাও। যেখানে বুঝতে পারবে না, আমার কাছে এস, বুঝিয়ে দেব।' যাক্, কাজ পেলাম একটা। যদিও বদখত কাজ—তবু এক সপ্তাহ মেহনত করে খানিকটা রপ্ত হল। উচ্চারণটা হ'ল না, মানেগুলো বুঝলাম—।"

"ফ্রেঞ্চ কাটলেট খেতে খুব ভাল, না ?"

হঠাৎ গোবর্ধন বলে উঠলেন।

"চমৎকার।"

"আমার বড় ছেলেটা কাটলেট বড্ড ভালবাসে। আপনার গল্প শুনে তার জন্যে হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল। সত্যি, জীবনে কিছুই করতে পারলাম না। তাকে একদিনও কাটলেট খাওয়াতে পারি নি হোটেলে। এক বিয়ে বাড়িতে কোথায় যেন খেয়েছিল। অথচ কি-ই বা দাম !"

"আপনি একটা মহৎ কাজ করেছেন যা আমি পারি নি।"

"কি।"

"বাবার সেবা।"

"হ্যাঁ, তা যতটা পেরেছি করেছি। একটু আগেই বাবার কথা মনে হচ্ছিল। কোলকাতাতেও এইরকম বৃষ্টি নেবেছে কিনা কে জানে। বৃষ্টির সময় বাবার ঘনঘন তামাক চাই। জগন্নাথ পারছে কিনা কে জানে।"

"জগন্নাথ কে ?"

"আমার মেজ ছেলে। তাকে তামাক সাজাটা শিখিয়েছি ভাল করে। বাবা তার সাজা তামাক পছন্দও করছেন আজকাল। নিন বলুন। তারপর কি হল—।"

"তারপর সাহেব একদিন আমাকে মেনু তৈরি করতে বললেন। তিনিই আগে মেনুটা করতেন। আমি নির্বোধের মতো অনেক ভুল করলাম। বকলেন আমাকে, কিন্তু যত্ন করে শিখিয়ে দিলেন। মাসখানেক মক্‌শ করবার পর মেনুর ব্যাপারটা সড়গড় হ'ল। একমাস পরে আমিই স্বাধীনভাবে মেনু তৈরি করতে লাগলাম নির্ভুলভাবে। তারপর সাহেব আমাকে কেটারিং শেখালেন। তারপর শেখালেন হাউস ম্যানেজমেন্ট। তারপর পেট্রোল বিল চেক্‌ করা। তারপর ক্রমশ আরও বিবিধ বিষয়ে পরিপক্ক করে তুললেন আমাকে। সিণ্ডেরিলা নাচ, অ্যাট হোম ডিনার, Dejeunor, গার্ডেন পার্টি, Priority table (এটা বড় শক্ত কাজ) সব শিখে ফেললাম একে একে। তারপর আস্তে আস্তে কন্‌ট্রোলার অব্‌ হাউস্‌-হোল্ডের যা যা কর্তব্য তাও শেখালেন। আমিই সব চালাতে লাগলাম শেষে। দিনকতক পরে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে গভর্ণমেণ্ট হাউসের সর্বঘটেই আমি বিরাজমান। আমার চাহিদাই হ'ল সবচেয়ে বেশী। A. D. C. নামেই রইলেন, তাঁর সব কাজ আমিই করতে লাগলাম। গভর্ণমেন্ট হাউসের স্টাফ্‌ সবাই আমার উপর খুশি। এমন কি His Excellencyও নাকি একদিন বলেছিলেন সান্যাল is indispensible. যে ব্রেট সাহেব আমার প্রতি অবিচার করে আমাকে দূর করে দিয়েছিলেন তিনিও আমার উপর সন্তুষ্ট হলেন। এই ব্রেট সাহেবই উত্তর-জীবনে আমার মস্ত বড় পেট্রন হয়েছিলেন, সে কথা পরে বলব। সাহেবরা যার উপর তুষ্ট হয় তাকে চড়চড় করে তুলে দেয়, আর যার উপর রুষ্ট হয় তাকে এক কোপে সাফ করে ফেলে।"

বাইরে ঝড়ের বেগটা আবার বাড়ল। সেই ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দটাও। গেরুয়াধারী নীরব হয়ে গেলেন। তারপর বলে উঠলেন, "ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ। জানি না ভগবান আজ কপালে কি লিখেছেন।"

গোবর্ধন সান্ত্বনার সুরে বললেন, "ওসব ভেবে আর কি হবে! যা বলছিলেন বলুন। অন্যমনস্ক থাকাই ভাল। তারপর কি হল— ?"

"এরপর সব হিল্ স্টেশনে টুর হতে লাগল। সব জায়গাতে A. D. C.র বদলে আমিই সব করতে লাগলাম। ডিনার পার্টি, গার্ডেন পার্টি, সিণ্ডেরিলা নাচ—সব আমিই ব্যবস্থা করতাম। এর পরই লর্ড সিন্হা গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হৈ হৈ পড়ে গেল। কোলকাতা থেকে ডক্টার আহ্‌মেদ এসে দু'দিনে তাঁর বারোটা দাঁত তুলে দিলেন। তখন আমরা পাটনা গভর্ণমেণ্ট হাউসে ফিরে এসেছি। লর্ড সিন্হার রাত্রে ঘুম হয় না, ভালো হজম হয় না। তিনি তখন দু'মাসের ছুটি নিয়ে সিমলা চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা তো গেলেনই, আর কয়েকজন চাকর-বেয়ারাও গেল। কিন্তু তিনি A. D. C.কে সঙ্গে নিলেন না। বললেন, সান্যাল থাকুক, তাহলেই হবে। সিমলায় থাকতে থাকতেই তিনি রেজিগ্‌নেশন দেন। তারপর এলিশিয়ম রোয়ে তাঁর নিজের বাড়িতে ফিরে যান। আমিও তাঁর সঙ্গে কোলকাতায় গেলাম। তিনি বললেন, 'পাটনায় গভর্ণমেণ্ট হাউসে আমার personal silver kits, type-writer প্রভৃতি অনেক জিনিস আছে, সেগুলো এখানে তুমি পৌঁছে দিয়ে যাও।' মার্ক, এসব জিনিস তাঁর A. D. C. বা প্রাইভেট সেক্রেটারিকে নিয়ে যেতে বললেন না, আমাকে বললেন। সত্যিই আমাকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখেছিলেন তিনি। তিনি এবং লেডি সিন্হা আমাকে বললেন, 'তুমি আপাতত আমাদের কাছে থাক। পরে ভাল চাকরি করে দেব। বর্ধমানের মহারাজা তোমারই মতো একজন করিৎকর্মা অথচ ভদ্র ছেলে খুঁজছেন A. D. C. করবেন বলে। আট শ টাকা মাইনে দেবেন। সেটা বেড়ে বেড়ে ১৫০০৲ পর্যন্ত হবে।' আমি পাটনায় ফিরে এলাম সোল্লাসে। লর্ড সিন্হার জায়গায় বিহার এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের

সিনিয়র মেম্বার তখন অ্যাক্‌টিং গভর্ণর হয়েছেন। আমি এ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু যে A. D. C. আমাকে চাকরি দিয়ে মানুষ করেছিল সেই ক্যাপ্টেন হ্যাসকেট্‌ আমাকে যেতে দিলে না। বলতেই মাথা নেড়ে বলে উঠল—'ও, নো, নো, নো, নো।' মিস্টার ব্রেটও আপত্তি করলেন। শুনলাম নতুন গভর্ণরও নাকি আমাকে ছাড়তে চান না। তখন আমি মাইনে পাচ্ছি ৫৬০৲ প্লাস ফ্রি বোর্ডিং, ফ্রি ধোবি, ফ্রি মোটরকার, ফ্রি পার্সোনাল চাকর। তাছাড়া গভর্ণমেণ্টের চাকরি, আখের অনেক ভাল। থেকে গেলাম। এক হিসেবে ভালই হ'ল, কারণ ঠিক তার পরই এলেন প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌। ও মশাই, থপ্‌ করে কি একটা ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। দেশলাই এনেছেন তো?"

"এনেছি, জ্বালাচ্ছি—"

গোবর্ধনবাবু দেশলাই জ্বালবার চেষ্টা করছিলেন। ভিজে গিয়েছিল, সহজে জ্বলে না। খস খস শব্দ হতে লাগল কেবল। অবশেষে একটা কাঠি জ্বলল, ভজুয়াদের লণ্ঠনটা তিনি দেখতে পেলেন, কিন্তু গেরুয়াধারীর ঘাড়ে কি লাফিয়ে পড়েছে সেটা বোঝা গেল না। অনেক চেষ্টা করে লণ্ঠনটা জ্বালা হ'ল শেষকালে। তারপর আবিষ্কৃত হল কোণে একটা কোলা ব্যাং বসে রয়েছে। বড় বড় চোখ বার করে চেয়ে রয়েছে গেরুয়াধারীর দিকে একদৃষ্টে। গোবর্ধনের মনে হ'ল যেন অবাক হয়ে গেছে গেরুয়াধারীকে দেখে। যেন বলতে চাইছে লাট বেলাটের সঙ্গে যার দিন কেটেছে সে এখানে কেন!

"বাবু, বাবু—।"

দেখা গেল দ্বারপ্রান্তে এক নারীমূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে।

"কে, ভজুয়ার বউ?"

"জি হাঁ।"

"কি?"

কোন উত্তর দেয় না। গোবর্ধন আলোটা তুলে ধরলেন। মুখে আলো পড়তেই মুচকি হাসল ভজুয়ার বউ, তারপর ঘাড়টা ফিরিয়ে নিলে। দেখা গেল তার হাতে একটা ডালার মতো কি রয়েছে।

"কি ওতে ?"

ক্ষীণ লজ্জিত কণ্ঠে যা বললে তার থেকে বোঝা গেল কিছু খাবার এনেছে।

"নিয়ে আয় দেখি—"

খুলে দেখা গেল অনেকখানি মালাই, কয়েকটা কলা এবং কিছু সন্দেশ এনেছে সে। আর একটা ছোট ঘটিতে দুধ আর ছোট্ট একটা নতুন সরা।

গোবর্ধন বললেন, "মালাই এনেছিস আবার দুধ কেন ?"

গেরুয়াধারী বললেন, "দুধ আমার পেটে সহ্যও হয় না। ক্ষীর, মালাই সহ্য হয় কিন্তু এমনি জোলো দুধ হয় না। এ এক আশ্চর্য রহস্য।"

ভজুয়ার বউ এর উত্তরে মৃদুকণ্ঠে যা বললে তাতে শিউরে উঠতে হ'ল দু'জনকেই। ও দুধ আর কলা এনেছে পীরবাবার সাপের জন্য। বললে রোজ রাত্রে ও সাপকে দুধ কলা দিয়ে যায়। ব্যাংও ধরে দিয়ে যায়। কাল একটা বড় ব্যাং ধরে গর্তে পুরে দিয়েছিল।

"সাপকে এরকম আশকারা দেওয়া কেন!" বলে উঠলেন গেরুয়াধারী।

ভজুয়ার বউ বললে, "পীরবাবা খুব জাগ্রত। তাঁরই গা ঘেঁষে তাই যাত্রীর ঘর বানিয়েছি আমরা। পীরবাবা কোনও অনিষ্ট করেন নি তাদের। ভালই করেছে। আর ওই সরপ্ (সর্প) মহারাজও এই কবরের আশে-পাশে বরাবর আছেন। কারও কোনও অনিষ্ট করেন নি, তাই আমরা ওকে খেতে দি—।"

গেরুয়াধারীর কানের পাশ দিয়ে লাফিয়ে ব্যাংটা ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণে চলে গেল।

ভজুয়ার বউ বললে—"এই যে সেই ব্যাংটা। এখনও খায় নি ওটাকে। বড় ভাল সাঁপ, খুব শুধ্‌ধা।"

গেরুয়াধারী বললেন—"এ তো বড় ভয়ঙ্কর সিচুয়েশনে পড়া গেল মশাই!"

"কুছ্‌ ডর নেই সাধু বাবা।"

সাহস দিলে ভজুয়ার বউ।

গোবর্ধন বললেন, "যা হবার হবে। আপাতত তো দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক।"

গোবর্ধন আর গেরুয়াধারী দু'জনেই ভূরিভোজন করলেন। মালাই অনেকখানি ছিল। সন্দেশও কম ছিল না।

"ভজুয়া ফিরেছে?"

জিজ্ঞেস করলেন গোবর্ধন।

"হ্যাঁ। আমি না গেলে ফিরত না। কালালিতে হাল্লা করছিল। আপনার জন্যে একটা হুক্কাও এনেছি। দোকানদার দোকান বন্ধ করে দিয়েছিল। দোকান খুলিয়ে নিয়ে এলাম। তামাক খেতে না পেলে কি রকম কষ্ট হয় তাতো জানি! আমি এখানেই তামাক হুঁকো বোড়শি সব দিয়ে যাচ্ছি। জলটা একটু ধরেছে—।"

গোবর্ধন বললেন, "এ ঘরের তো চারদিকেই চুঁইছে। তোর ঘর কেমন?"

"আমার ঘরেরও ওই হাল (অবস্থা)। পিয়ক্কড় (মাতাল) লোককে নিয়ে ঘর করি, ও কি কিছু দেখে!"

"সাধুবাবার থলিটা ভিজে যাচ্ছে—।"

"আচ্ছা, ওটা আমাকে দিন, আমার সিন্দুকে রেখে দিচ্ছি গিয়ে।"

"বেশ, সেই ভালো। ওতে দরকারি একটা চিঠি আছে। ভিজে গেলে লেখাটা নষ্ট হয়ে যাবে।"

গেরুয়াধারী তার থলিটা দিয়ে দিলেন ভজুয়ার বউকে। নস্যির ডিবেটা বার করে রাখলেন শুধু। ভজুয়ার বউ যাবার আগে দুধে কলাটা চট্‌কে পাকা দেওয়ালটার এক কোণে রেখে গেল।

সে চলে যাবার পর গেরুয়াধারী এক টিপ্ নস্যি নিয়ে বললেন, "ওয়াণ্ডারফুল। আজ এই অশিক্ষিতা বিহারী গ্রাম্যবধূর যে পরিচয় পেলাম তা অপূর্ব। এরই ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে আর একটি মেয়ের কথা মনে পড়ছে। সে কথা পরে বলব। আমরা এদের হতশ্রদ্ধা করে ওই হারামজাদীদের নকল করি। তাই আমাদের এই দুর্দশা। বেশ্যা আর লুচ্‌চায় দেশ ভরে গেল!"

গোবর্ধন বললেন—"মানুষের পশুত্বতো সহজে যেতে চায় না—"

"চায় না তা মানি। কিন্তু পশুত্ব নিয়ে আস্ফালন, পশুত্বের পূজা এখন যতটা হয়েছে আগে ততটা ছিল না।"

একটু পরেই ভজুয়ায় বউ নতুন হুঁকোয় এক কলকে তামাক সেজে নিয়ে এল। তারপর নিয়ে এল কিছু তামাক আর কাঠকয়লা। তারপর একটা মাটির বোড়শিও দিয়ে গেল। বিহার অঞ্চলে এ জিনিসটার খুব চলন গরীবদের ঘরে। এতে আগুন থাকে। একটি ছোট লোহার চিমটেও নিয়ে এসেছিল সে। সব গুছিয়ে দিয়ে বললে, "আমি এবার চললাম। ওকে খাওয়াই গে—"

"ভজুয়া কি করছে?"

"কি আর করবে, পড়ে আছে মড়ার মতো।"

মুচ্‌কি হেসে চলে গেল ভজুয়ার বউ।

হুঁকোয় একটা টান দিয়ে গোবর্ধন বললেন, "এবার বেশ জমেছে। নিন এবার শুরু করুন আপনার জীবন-কাহিনী। অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার।"

"হয়েছে। কিন্তু তাতে আমার কৃতিত্ব আছে বলে মনে করি না। ওই অদৃশ্য হস্ত আমার অদৃশ্য টিকি ধরে আমাকে যেখানে নিয়ে গেছে সেখানেই আমি গেছি।"

"তারপর কি হ'ল বলুন—"

"আমি তো ওই গভর্ণমেণ্ট হাউসের চাকরিতে রয়ে গেলাম। তারপরই নতুন হিড়িক—প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ ভারত ভ্রমণে আসছেন। বিহারে সাতদিন থাকবেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসেই থাকবেন। থাকলেনও তাই। গভর্ণর তাঁকে পুরো গভর্ণমেণ্ট হাউসটি ছেড়ে দিয়ে নিজে টেণ্টে গিয়ে রইলেন।"

"প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ মানে?"

"যিনি এড্‌ওয়ার্ড দি এইট্‌থ্ হয়ে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পরে মিসেস্ সিম্পসনকে বিয়ে করে সে সিংহাসন ত্যাগ করেন—যিনি এখন ডিউক অব্ উইণ্ডসর নামে পরিচিত। তিনিই—"

"ও। তারপর?"

"তাঁর আসবার খবর আসতেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল গভর্ণমেণ্ট হাউসে। শুধু গভর্ণমেণ্ট হাউসে নয়, সারা দেশময়। তাঁকে দেশের নেতারা অভ্যর্থনা করেন নি, ব্ল্যাক ফ্ল্যাগ দেখিয়েছিলেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসে কিন্তু অভ্যর্থনার চূড়ান্ত আয়োজন করতে হ'ল। মিস্টার ব্রেট আমাকে কোলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন নতুন জিনিসপত্র কিনতে। রাজপুত্র স্বয়ং আসছেন তাঁর জন্যে সব নতুন জিনিস চাই। মানি ইজ্ নো কোশ্চেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসকে রিজুভিনেট্ করতে হবে। চলে গেলাম কোলকাতায়। নতুন কাট্‌লারি, নতুন পর্দা, নতুন কার্পেট, নতুন বিছানা—

—আরও সব নানা রকম নতুন জিনিস কিনলাম আর্মি নেভি স্টোর্স এবং আরও অনেক বড় বড় দোকান থেকে। ছিলাম গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে। প্রায় লাখ খানেক টাকা খরচ হ'ল আমার হাত দিয়ে। কর্তারা আমার কাজের খুব তারিফ করলেন। পাঁচ হাজার টাকার একটি 'চেক্' পেলাম বক্শিশ হিসাবে। আর্মি নেভি স্টোরের কর্তারাও আমাকে একটি হাজার টাকার বেয়ারার 'চেক্' অফার করেছিলেন, কিন্তু আমি সেটি নিই নি। ব্রেট সাহেব আমার অনেস্টি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।"

গোবর্ধন সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন—"আপনাকে দেখলেই মনে হয় আপনি অনেস্ট লোক।"

"তাই না কি! কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন যা চকচক করে তা-ই সোনা নয়। সোনার শেষ বিচার কষ্টিপাথরে—"

"যাক ও কথা। তারপর কি হ'ল বলুন—"

"তারপর নির্দিষ্ট দিনে এসে পড়লেন হিজ রয়াল হাইনেস। আমরা তাঁর জন্যে প্রস্তুতই ছিলাম। যদিও বাইরে সব 'বয়কট্' চলছিল কিন্তু গভর্ণমেণ্ট হাউসে সাড়ম্বরে স্টেট ডিনারের বন্দোবস্ত হ'ল। এখন স্টেট ডিনারের নিয়ম হচ্ছে রাজার পাশে রানী থাকবে। কিন্তু প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ অবিবাহিত, তাই তাঁর জন্যে একটি অ্যাক্‌টিং রানীও ঠিক করতে হ'ল। এক বড় অফিসারের একটি সুন্দরী পালিতা কন্যা ছিলেন, তাঁকে রানীর পদে বরণ করা হ'ল। তিনি যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন। ভজুয়ার বউকে দেখে তার কথাই মনে হচ্ছিল। সাত দিনের জন্য রাজপুত্রের স্পেশাল সিকিউরিটি অফিসার হয়ে এলেন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দুজন স্পেশাল চীফ কনেস্টবল, তাছাড়া পার্সোনাল A. D. C., পার্সোনাল সেক্রেটারি, পার্সোনাল মোটর ড্রাইভার, স্পেশাল ভ্যালেটস্। দস্তুর-মতো রাজকীয় আড়ম্বরে এলেন রাজপুত্র। সমস্ত ভারতবর্ষের সি. আই. ডি. অফিসাররা, বিহার পুলিশের আই. জি., ডি. আই. জি.,

এস. পি., ডি. এস. পি., আর ইন্‌স্পেকটররা সবাই চাপরাশি-উর্দি পরে পাহারা দিতে লাগলেন। গভর্ণমেন্ট হাউস সরগরম হয়ে উঠল—"

গোবর্ধন বললেন, "আমাদের গরীব গৃহস্থদের ঘর সরগরম হয়ে ওঠে বিয়ে-টিয়ে হলে। যাদের বাড়িতে দুর্গাপুজো হয় তাদের বাড়িও সেই সময় গমগম করে—"

"ঠিক বলেছেন, এ-ও অনেকটা সেই রকম। তবে বিয়েবাড়িতে বা দুর্গাপুজোতে যে আনন্দ হয় সে আনন্দটা এখানে নেই। সব যেন চুপ-চাপ, নিস্তব্ধ। স্টেট্ ডিনার হচ্ছে, কিন্তু আনন্দ-কলরব নেই, ফিসফিস কথা, মাঝে মাঝে ছোট্ট মেকি হাসি, আর কাঁটা চামচের শব্দ—ব্যস্—"

"আমাদের দেশের বাড়িতে একবার দুর্গাপুজো হয়েছিল, কি যে আনন্দ হয়েছিল! গ্রামের সব গরীব দুঃখীদের বাবা খাইয়েছিলেন আর একখানা করে কাপড় দিয়েছিলেন। কি দিন ছিল! আজ আমাদের নিজেদের কাপড় কেনবার পয়সা নেই—"

"সবই টিকির টানের ব্যাপার। তাঁর যদি মর্জি হয়, সব হবে আবার।"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই। বলুন, তারপর কি হল—"

"হিজ্ রয়াল হাইনেস যে ক'দিন রইলেন সে ক'দিন খুব সরগরম ছিল গভর্ণমেন্ট হাউস। তারপর চলে গেলেন তিনি। যাবার সময় আমাকে একটা সোনার সিগারেট কেস দিয়ে গিয়েছিলেন। আর শেক্‌হ্যাণ্ড করে বলেছিলেন—Remember me when you wish. আমার সেবায় খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। জিগ্যেসও করেছিলেন আমি কি চাই। উত্তরে আমি বলেছিলাম, কিছু না। যদি বলতাম আমাকে কোথাও District Magistrate করে দিন তাও দিতেন বোধ হয়।

কিন্তু আমার তখন সাংসারিক বুদ্ধি কিছু হয় নি। প্রিন্স অব ওয়েলস্ চলে যাবার পর যিনি পার্মানেণ্ট গভর্ণর হবেন তিনি এলেন। তিনি সব নিজের স্টাফ নিয়ে এলেন। নতুন A. D. C, নতুন প্রাইভেট সেক্রেটারি এল। ব্রেট্ সাহেব গয়াতে ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গেলেন। হ্যাস্কেট সাহেব চলে গেলেন বিলেতে। আমি অভিভাবক-হীন হয়ে একটু অসুবিধায় পড়লাম। ব্রেট সাহেব আমাকে পরামর্শ দিলেন, তুমি পুলিশে ঢোক। তাঁরই রেকমেণ্ডেশন পেয়ে অবশেষে নমিনেশন পেলাম। ট্রেনিং নিতে গেলাম হাজারিবাগে। জীবনে আবার নতুন পর্ব আরম্ভ হ'ল। অদৃশ্য হস্তটি আমার অদৃশ্য টিকি ধরে আবার আমাকে নতুন জায়গায় নিয়ে এলেন।"

"আমিও পুলিশে ঢোকবার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। পুলিশ হলেই যে মন্দ হবে এমন কি কথা আছে। আমাদের সীতারামবাবু দারোগা দেবতুল্য লোক ছিলেন।"

"দেবতুল্য লোক যে দৈত্যদের মধ্যেও আছে এ কথা তো আমাদের পুরাণেই আছে। শেষনাগ, প্রহলাদ এরা তো দৈত্যকুলের লোক।"

"আপনার পুলিশ লাইন কেমন লাগল ?"

"চাকরি, চাকরি ! ওর আবার লাগালাগি কি আছে। মনিবকে খুশি রেখে যতটা পার নিজের কোলের দিকে ঝোল টান, এই হ'ল মন্ত্র। এই ভাবে কাটল কিছুদিন। বেশ কিছুদিন। কয়েক বছরের কথা বাদ দিয়েই যাচ্ছি, কারণ বলবার মতো কোনও ইণ্টারেস্টিং ঘটনা ঘটেনি ও ক'বছরে। কেবল দিনগত পাপক্ষয়—"

"দারোগাদের জীবনে তো অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে শুনেছি। আপনার জীবনেও নিশ্চয় ঘটেছে দু'একটা। তাই শুনি না—যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

"রোমাঞ্চকর ঘটনা? তা ঘটেছে বইকি। আচ্ছা একটা ঘটনা বলি। এর থেকে বুঝতে পারবেন কি ভীষণ কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে আমাকে। আমি তখন ছাপরা জেলার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব পুলিশের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইনস্পেক্টার হয়ে কাজ করছি। এমন সময় একদিন এক সি.আই.ডি. এলেন। তাঁর নামটা আর করব না, ধরুন ইন্দ্রবাবু। তিনি এলেন একটা নোট জাল কেসের মাল-মসলা নিয়ে। তিনি ওই নোট জালের আখড়া কোথায় তা আন্দাজ করেছেন, কিন্তু প্রমাণের অভাবে হাতে-নাতে তাদের ধরতে পারছেন না। তিনি আমাকে তাঁর সহকারীরূপে নির্বাচন করলেন অতীব গোপনে। তিনি গিয়ে এস. পি.-কে অনুরোধ করলেন যেন আমাকে তাঁর সঙ্গে ডেপিউট (depute) করা হয়। এস. পি. রাজী হলেন, আমিও রাজী হলাম। তখন খাতায় পত্রে পুলিশে সার্ভিস থেকে আমাকে লোপাট করে দেওয়া হ'ল। গেজেটে ছাপা হয়ে গেল যে আমি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি। এর কারণ পরে জানবেন, আমারই হিতার্থে করা হ'ল এটা। আমার বাড়িতে গিয়ে বলা হ'ল যে খবরটা ভুলক্রমে গেজেটে বেরিয়েছে। আমার চাকরি যায় নি, ঠিকই আছে। পুলিশ আপিস থেকে পুলিশের লোক এসে আমার স্ত্রীর হাতে মাইনে পেঁৗছে দিয়ে যাবেন। তবে ব্যাপারটা যেন কিছুতেই জানাজানি না হয়, কারণ এটা একটা টপ্ সিক্রেট। পাবলিক জানবে আমি আর পুলিশে চাকরি করছি না। এই বন্দোবস্ত হবার পর আমি আর ইন্দ্রবাবু একদিন বস্তি অভিমুখে যাত্রা করলাম। বলা বাহুল্য ছদ্মবেশে। ওখানে পেঁৗছে ইন্দ্রবাবু আমাকে যা নির্দেশ দিলেন তাতে আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। বললেন —'এখান থেকে সোজা উত্তরে চলে যাও। দিঘ্ওয়ারা গ্রামে পেঁৗছবে। সেখান থেকে দক্ষিণমুখে চলতে হবে। রাস্তায় ভোল বদলে ফেলতে হবে একবারে। কামাতে পাবে না, খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি

গজানো চাই। তোমার লম্বা চুল কেটে ছোট ছোট করে ফেলে একটি টিকি রাখবে। চুলে তেল দিও না, উস্কখুস্ক হওয়া চাই। বাঁ চোখটি ঈষৎ বুজে থাকবে, দাঁতে মিশি দেবে। গায়ে জামা থাকবে না, কাপড়টি হবে ময়লা এবং ছেঁড়া। অর্থাৎ একটি আস্ত উজবুক পাড়াগেঁয়ে ভূত সাজতে হবে তোমাকে। দিঘ্‌ওয়ারা থেকে মাইল তিনেক দক্ষিণ-মুখো চলে একটি বটগাছ দেখতে পাবে। আর সেখানে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে তাকালে দেখতে পাবে একটি প্রকাণ্ড মাঠ। সেই দিকে গুটিগুটি এগুবে। একটু পরেই দেখতে পাবে প্রকাণ্ড একটি আউট হাউস রয়েছে, খড় দিয়ে ছাওয়া। তারই আশপাশে ক্যাবলার মতো ঘোরাফেরা করতে থাকবে। তারপর সবই অনিশ্চিত। ভববান যা করেন তাই হবে। তোমায় একটি কাজ রোজ করতে হবে। ওখানে যা দেখবে বা শুনবে তা প্রতি বৃহস্পতিবার কাগজে পেন্সিল দিয়ে লিখে, যেমন করে পার রাত বারোটার পর তিন মাইল পশ্চিমে যে পুকুরটা আছে তার তীরবর্তী তালগাছের পাশে যাবে। সেখানে দেখবে নুড়ি-দিয়ে-চাপা-দেওয়া আর একটা কাগজ রয়েছে। সেই দুটো কাগজ নিয়ে আরও দু'মাইল গিয়ে পোস্ট আপিসে—Crime assistant to D. I. G., C. I. D. —এই ঠিকানায় বেয়ারিং পোস্ট করে দেবে until further orders."

—এই ভয়ঙ্কর নির্দেশ দিয়ে ইন্দ্রবাবু চলে গেলেন। আমিও রওনা হলাম। যথাসময়ে সেই বটবৃক্ষ আর খোড়ো আউট্-হাউসের সাক্ষাৎ পেলাম। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যা হ'য়ে এল। আমি সেই খোড়ো চালাটার কাছে এগিয়ে গেলাম আর একটু, তারপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। জনপ্রাণীর সাড়া নেই। গা-টা ছমছম করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম একটি আলোর রেখা একটা ঘর থেকে বেরুচ্ছে। আর একটু এগিয়ে দেখলাম একটা

ঘোড়াও সেই ঘরে রয়েছে। কি করব ভাবছি এমন সময় গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনলাম—"কৌন্ হ্যায়রে শালা!" আমি তো অবাক। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতের মতো একটা লোক বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এসেই বলল, "তু শালা হিঁয়া কি করত্‌বানি?"—বলেই সঙ্গে সঙ্গে আমার গালে প্রচণ্ড চড় মারলে একটা। টাল খেয়ে পড়ে গেলাম এবং পুলিশে চাকরি করার যে কি অপরিসীম আনন্দ তা তৎক্ষণাৎ অনুভব করলাম। তারপর উঠে হাতজোড় করে করুণকণ্ঠে বললাম—"জী অন্‌দাতা, ম্যয় ভিখারী ছি, নোক্‌রি ঢুঁড়েইছি। তিনদিন কুছু ন খাইলবানি"—বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলাম। থিয়েটার করা অভ্যাস ছিল তো, পার্ট টা বেশ জমিয়ে ফেললাম। ডাকাত ব্যাটার প্রাণেও করুণার সঞ্চার হ'ল। বললে—"ঘোড়াকা কাম জানতানি? সহিস রে শালা।" বললাম, "হাঁ, হুজুর।" চাকরিটি হ'ল। আমার কাজ হ'ল একটি ছোট সাদা নেপালী ঘোড়ার ঘাস কাটা, ডলাই মলাই করা আর রোজ বিকেলে তাকে একটি খুঁটিতে বেঁধে চক্র-দৌড় করানো। আমার শোবার জায়গা হ'ল ওই আস্তাবলেই। ঘোড়ার মুত আর লিদ্দির উপর। মনিব একটি ছেঁড়া বিরাটগঞ্জের কম্বল দিলেন। সেইটিই আমার সম্বল হ'ল। ভাঙা মাটির সান্‌কিতে লাল মোটা চালের ভাত দিত, ভাত ছাড়া তাতে থাকত প্রচুর কাঁকর আর ধান। তাই খুব মিষ্টি লাগত, কারণ হাঙ্গারের সস্'টি ছিল। সমস্ত দিনে ওই একটিবার মাত্র খাওয়া জুটত তিনটে আন্দাজ। আস্তাবলটা আমি যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন রাখতাম। 'লিদ্দি' বেশী জমতে দিতাম না। তাই বেশী গন্ধও হত না, মাছিও হত না। কিরকম মাছি শুনবেন? বিরাট বড় গো-মাছি। রাম-মাছি বললে আরও ঠিক হয়। ঘোড়াদের শত্রু। সর্বাঙ্গে ঘা করে দেয়। আমি আস্তাবলটা পরিষ্কার রাখাতে মাছির উপদ্রব কমল। আমিও বাঁচলুম, ঘোড়াটাও বাঁচল। সুযোগ

পেলে মাছি মারতুমও। মেরে মেরেই প্রায় নির্মূল করেছিলাম। এই সব দেখে ঘোড়ার মালিক একটু সদয় হলেন আমার প্রতি। ঘোড়ার চেহারা দেখে খুশী হলেন। ভাতের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু আচার দিতে লাগলেন।"

গোবর্ধন বলে উঠলেন, "মনে হচ্ছে যেন শার্লক্ হোম্‌স্-এর গল্প পড়ছি। তারপর ?"

"আমার কাছে ক্যালেণ্ডার ছিল না। দেওয়ালে একটি করে দাগ কেটে রাখতাম কবে বৃহস্পতিবার ঠিক করার জন্যে। প্রতি বৃহস্পতি-বারে গভীর রাত্রে শুধু পায়ে হেঁটে কম্বল জড়িয়ে তিনটি মাইল পথ অতিক্রম করে সেই পুকুরধারে গিয়ে পৌঁছতাম আর সেই তালগাছের আশ-পাশে হাতড়াতাম নুড়ি-চাপা-দেওয়া কোনও কাগজ আছে কি না। সেখানে সাপ বিছে কাঁটা, বড় বড় মশা সবই ছিল, ভগবান আমাকে রক্ষা করতেন। প্রতিবারই কাগজ পেতাম এবং সেটা গিয়ে নির্দেশমতো পোস্ট করে দিতাম তুমাইল দূরের সেই পোস্টাফিসে। আমি নিজেও কিছু কাগজ আর পেন্সিল লুকিয়ে যোগাড় করেছিলাম। আমার রিপোর্টও সেই সঙ্গে পাঠাতাম as orderd by Indra Babu. চিঠি পোস্ট করে ওই পাঁচ মাইল পথ আবার হেঁটে ফিরে আসতাম নগ্নপদে ও নগ্নগাত্রে কম্বল জড়িয়ে। ফিরে এসেই শুয়ে পড়তাম। সকালে উঠে ঘোড়ার ডলাই মলাই তারপর ঘাস-কাটা।...

আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। ওই খোড়ো ঘড়টার সামনে একটা ইঁদারা ছিল আর সেই ইঁদারার ধারে ছিল কিছু ফুলগাছের ঝোপ-ঝাপ। তার মধ্যে ছিল একটা পাথরের চৌতারা গোছের। ওই ডাকাতের মতো লোকটা তার উপর প্রায় সমস্ত দিন বসে থাকত। কখনও রুটি বানাচ্ছে, কখনও ডন করছে, কখনও খাটিয়া বিছিয়ে শুয়ে আর একটা লোককে দিয়ে গা হাত-পা টেপাচ্ছে। আমি যা যা দেখতাম

প্রতি বৃহস্পতিবার জানিয়ে দিতাম। এইভাবে চলল প্রায় চৌদ্দ সপ্তাহের খেল। তারপর একদিন খুব ভোরে যবনিকা উঠল। দেখি এক বিরাট পুলিশ বাহিনী সমস্ত মাঠটা ঘিরে ফেলেছে। রাত্রেই ঘিরেছে। ভোর না হতেই প্রায় পঁচিশটি মিলিটারি পুলিশ বন্দুক নিয়ে এগিয়ে এল, সঙ্গে তাদের স্বয়ং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ, তাঁর হাতেও রিভলভার। তারা এগিয়ে গেল ইঁদারাটার দিকে। তারপর সেটাকে ঘিরে ফেললে। তারপর সেই চৌতারাটার পাথর তুলে সরিয়ে দিলে দূরে। প্রকাণ্ড একটা টানেল বেরিয়ে পড়ল।"

"টানেল ?"—সবিস্ময়ে বলে উঠলেন গোবর্ধন।

"হ্যাঁ মশাই টানেল। বিরাট টানেল—"

"তারপর ?"

"টানেলে ঢুকে পড়ল সবাই। পুলিশ সাহেবসুদ্ধ—। দুম্ করে একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তারপর সব চুপচাপ। একটু পরে বারোটি লোককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে বেরুলেন তাঁরা। সবিস্ময়ে দেখলাম অ্যারেস্টেড লোকেদের মধ্যে ইন্দ্রবাবুও রয়েছেন। তখন বুঝলাম ব্যাপারটা। ইন্দ্রবাবু ছদ্মবেশে ওদের বিশ্বাস উৎপাদন করে ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন। তিনিই রোজ তাল-গাছের নীচে গুপ্তখবর লিখে রেখে আসতেন প্রতি বৃহস্পতিবারে। আর আমি সেটা পোস্ট করে আসতাম। টানেলের ভিতর একটু খণ্ড-যুদ্ধ হয়েছিল। এস. পি. একটি লোককে গুলি করে মেরে ফেলেছিলেন আর ওরা গড়াশা দিয়ে একটি পুলিশের একটি হাত কেটে দিয়েছিল। সেই নিহত ব্যক্তি এবং আহত পুলিশটিকে পুলিশ ভ্যানে চড়ানো হ'ল। নোট জাল করবার সব জার্মান-মেড যন্ত্রপাতিও ধরা পড়ল। শুধু তাই নয় নোট ছাপাবার কাগজ, একশ টাকা আর দশ টাকার অনেক ছাপা নোটও পাওয়া গেল। বামালসুদ্ধ ধরা পড়লেন জালিয়াত মহেন্দর মিশির

দলবল সমেত। আমিও অ্যারেস্টেড হলাম। আমাকে আর অন্য বারোজন আসামীকে স্টেশন পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। বারো মাইল রাস্তা। আর সে কি রাস্তা! তাছাড়া পুলিশদের অকথ্য অত্যাচার, গালাগালি আর মার। প্রস্রাব করতে বসলেও মারছে। পুলিশদের ব্যবহারে বেশ জখম হলাম মনে মনে। আমার সেই ঈষৎ-বোজা চোখ আরও বুজে গেল, ঝোলা-ঠোঁট আরও ঝুলে পড়ল। অবশেষে ছাপরা জেলে গিয়ে হাজির হলাম এবং ঢুকলাম একটা সেলে। প্রত্যেকেরই আলাদা সেল। কারও সঙ্গে কথা বলবার জো নেই। আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছেন।"

"তারপর?"

"কি আর করব? বসে রইলাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। এক-একবার সন্দেহ হতে লাগল গভর্ণমেণ্ট কি আমার কথা ভুলে গেল? তা না হলে একি ব্যাপার! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! মনের মধ্যে হতাশার অন্ধকার ঘনীভূত হতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই ভগবান প্রসন্ন হলেন। গভীর রাত্রে অন্ধকার দূর করে সূর্য উঠল। মানে, আমার পূর্ব-পরিচিত জেলারবাবু একটি টিফিন-কেরিয়ার আর ফ্লাস্ক হাতে করে আমার সেলে ঢুকলেন। টিফিন কেরিয়ারে মাখন পাঁউরুটি আর ডিম, ফ্লাস্কে গরম চা। প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। অনেকদিন পরে ভদ্র-খাওয়া খেয়ে বাঁচলাম। জেলারবাবু বললেন, কোনও ভয় নেই। আমার প্রতি এই দুর্ব্যবহার লোক-দেখানো, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার খাবার জেলারবাবু রোজ দিয়ে যাবেন। এস. পি. নিজে এই নির্দেশ দিয়েছেন। ইন্দ্রবাবুও আলাদা একটা সেলে আছেন এবং তাঁকেও জেলারবাবু চা-পাঁউরুটি খাইয়ে এসেছেন। এস. পি. বলেছেন আমি যেন আমার চোখটা আধ-বোজা করেই রাখি। অন্তত যখন কোর্টে দাঁড়াব তখন যেন চোখটা ওইরকমই থাকে।

পরদিনই ছাপরা কোর্টে আমাদের হাজির করা হ'ল। খালি পা, শুধু গা, লম্বা গোঁফ দাড়ি, মাথার লম্বা চুলে জটা। পায়ে হেঁটে গেলাম ছাপরা শহরের ভিতর দিয়ে। ভারি লজ্জা করছিল, মনে হচ্ছিল ওই বুঝি কেউ চিনে ফেলল। সেখানে বাঙালীদের মধ্যে আমি খুব পপুলার ছিলাম তো, কালীবাড়িতে 'সীতা' প্লেতে রাম সেজে প্রভূত খ্যাতি ও একটি স্বর্ণপদক অর্জন করেছিলাম। আমি হাঁটবার সময় মাথা হেঁট করে প্রায় দু'চোখ বুজেই চলছিলাম, খরগোশরা যেমন বিপদে পড়লে চোখ বুজে একজায়গায় বসে পড়ে—আমারও মনোভাব অনেকটা তেমনি হ'ল। এস. ডি. ও সাহেবের কোর্টে হাজির হলাম। সেখানে গভর্ণমেণ্ট প্লীডার এবং কোর্ট-সাবইন্সপেক্টার দরখাস্ত করলেন যে আমরা গভর্ণমেণ্ট অ্যাপ্রুভার হয়েছি, আমাদের ছেড়ে দেওয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ছাড়া পেয়ে গেলাম। তারপরদিনই ভোলও বদলে ফেললাম। গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে, চুল ছেঁটে সাবান দিয়ে স্নান করে পূর্ববৎ হয়ে গেলাম আবার। আধ-বোজা চোখ আর আধ-বোজা রইল না, পুরো খুলে গেল। তারপরদিন থেকে পুলিশের পোশাক পরে পুলিশের কাজ করতে লেগে গেলাম। এমন কি ওদের ট্রায়াল দেখতেও যেতাম। মহেন্দ্র মিশির আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা আমাকে আর ইন্দ্রবাবুকে আর চিনতেই পারল না। তাদের চক্ষে আমরা লোপাট হয়ে গেলাম। যথা নিয়মে বিচার হ'ল তাদের এবং যথাকালে জেল হয়ে গেল সব ক'টার। আমাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হ'ল এবং যাতে আমি ইন্সপেক্টার হতে পারি তার জন্যে রেকমেণ্ড করা হ'ল। ইন্দ্রবাবু ডি. এস. পি. হলেন এবং দু'হাজার টাকা পুরস্কার পেলেন। তিনি যে সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা অসাধারণ—"

গেরুয়াধারী চুপ করলেন।

বাইরের ঝড়টা প্রবল হয়ে উঠল আবার। গঙ্গার পাড়-ভাঙার শব্দটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

গোবর্ধন বললেন—"আপনার অভিজ্ঞতাটাও অসাধারণ।"

গেরুয়াধারী মৃদু হাসলেন।

"আপনাদের কাছে যেটা অসাধারণ মনে হয় আমাদের কাছে সেটাই সাধারণ। ওই আমাদের জীবন। তবে একটা কথা বলব, এ জীবনে যেমন মন্দও দেখেছি তেমনি ভালও দেখেছি অনেক। পঙ্ক আছে কিন্তু পঙ্কজও দেখা যায় মাঝে মাঝে দু'একটা।"

"তাই নাকি! শোনান না তাদের কথা। আপনি না থাকলে কি করে যে এই দুর্যোগের রাত্রি কাটত কে জানে। গল্পের নৌকোয় চড়ে যেন উদ্দাম পদ্মা অতি সহজে পার হয়ে যাচ্ছি।"

হা হা করে হেসে উঠলেন গেরুয়াধারী।

"আপনি কবি লোক দেখছি—"

তারপর চুপ করে ভাবলেন একটু। তারপর বললেন,—"আচ্ছা শুনুন তবে। দুটো ঘটনা মনে পড়েছে। প্রথমটা পঙ্কের, দ্বিতীয়টা পঙ্কজের। প্রথমটা আগে শুনুন। তখন আমি কটকে ডি. আই. জি'র সঙ্গে আছি। ছুটিতে বাড়ি এসেছিলাম, ফিরে যাচ্ছি। সাদা পোশাকেই স্টেশনে এসেছি, কোমরে অবশ্য রিভলভার বাঁধা ছিল। পুরী এক্‌স্‌প্রেস তখন রাত আটটা কুড়ি মিনিটে দশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ত। আমি আমার কম্পার্টমেণ্টটির সামনে দাঁড়িয়ে নস্যি নিচ্ছি, এমন সময় একটি সুন্দরী মেয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে। রীতিমতো সুন্দরী, তাছাড়া ঠোঁটে রং, গালে রং, চোখে কাজল। মুখচোখে একটা উতলা অসহায় ভাব। মাথার আঁচল আর বুকের কাপড় বারবার খুলে খুলে পড়ছে। এসে কমনীয় কণ্ঠে বললেন,—"আমাকে একটু সাহায্য করবেন? বড় বিপদে পড়েছি।" জিগ্যেস করলাম,—"কি করতে পারি

বলুন।” তিনি বললেন যে কটকের আদালতে কালই আমার একটা জরুরি মকদ্দমা আছে। সেইজন্যে কটক যাচ্ছি। কিন্তু এখানে হঠাৎ আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা চুরি হয়ে গেল। তাতে আমার টিকিট টাকাকড়ি সব আছে। আপনি দয়া করে আমাকে কটক পর্যন্ত পৌঁছে দিন!” হেসে উত্তর দিলাম, “মাফ করবেন, আমি পারব না।” শুনে সরে গেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটাও ছাড়ল। আমি একটা সেকেণ্ড ক্লাসের খালি কামরায় উঠে পড়লুম। ওমা, দেখি মেয়েটাও উঠেছে আমার পিছু পিছু। সঙ্গে সঙ্গে একটা গণ্ডামার্কা গুণ্ডা গোছের ছোকরা ট্রেনের ফুটবোর্ডে উঠে হাতল ধরে দাঁড়াল। ট্রেন ইতিমধ্যে ‘স্পীড্’ নিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়েছে। গুণ্ডাটাও ঢুকল কামরার ভিতরে এবং মেয়েটা তাকে দেখে বলে উঠল—‘আরে, তুমি এখানে!’ লোকটি ভুরু আর চোখের ইশারায় মানা করল তাকে কোন কথা বলতে। আমি বুঝলাম ব্যাপার সুবিধের নয়, গড়বড় আছে কিছু। ট্রেন তখন ফুল স্পীডে্ চলেছে। আমি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে স্বগতোক্তি করলাম একটি—“আমি পুলিশের লোক, সঙ্গে লোডেড রিভলভার আছে। বাড়াবাড়ি করলে নিজেরাই বিপদে পড়বেন।” একথা শুনে দু'জনেই নির্বাক হয়ে গেল। ট্রেন চলেছে, খড়গ্‌পুরের আগে থামবে না। পাক্কা দেড়টি ঘন্টা লাগবে খড়গ্‌পুর পৌঁছতে। তিনজনেই নির্বাক হয়ে বসে কাটিয়ে দিলাম সময়টা। ট্রেন খড়গ্‌পুর স্টেশনে ঢুকতে না ঢুকতেই তিনজন টি. টি. আই. উঠে পড়লেন আমাদের কামরায়। তিনজনই আমার খুব চেনা—মার্টিন, উইলিয়াম্‌স্ আর মজুমদার। তিনজনেই প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, হ্যালো, স্যানিয়েল কোথা চলেছ? বললাম, কটক। তারপর তাঁরা ‘চেকিং’ শুরু করলেন। মেয়েটির কাছে টিকিট চাইতেই তিনি কি বললেন জানেন? আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, “উনি আমার স্বামী। ওঁর কাছে টিকিট আছে!” আমি শুনে

বজ্রাহতবৎ দাঁড়িয়ে রইলাম। মজুমদার আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে বললেন—"সত্যি নাকি?"

আমার বিস্ময়ের ভাবটা কেটে গিয়েছিল। মনে একটু রস-সঞ্চারও হ'ল। বললাম, "আমার সাত পাকের বউ তো আমার বাড়িতে আছে। ইনি বোধহয় বিপাকের বউ হতে চাচ্ছেন!" হেসে উঠলেন মজুমদার। মার্টিন বাংলা জানেন না। আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—What's the fun? বললাম, She poses to be my wife. It is a damn mendacious lie. ওদের দু'জনের কারো কাছেই টিকিট ছিল না, পয়সাও ছিল না। তাদের পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করে টি. টি. আই-রা অন্য গাড়িতে গিয়ে উঠল। বুঝুন ব্যাপারটা। পথে ঘাটে কত রকম বিপদেই যে পড়তে হয়। ভগবানই রক্ষা করেন সব।"

গেরুয়াধারী নীরব হলেন।

গোবর্ধন বললেন, "আমি কখনও দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর পাল্লায় পড়ি নি। একবার একটা ট্রেনে এক বাইজির সঙ্গে এক কামরায় গিয়েছিলাম কিছুদূর। আমি একধারে চুপ করে বসেছিলাম, সে-ও আমার দিকে নজর দেয় নি বিশেষ। এক দাড়িওলা মিঞাসাহেবের সঙ্গেই গল্প করছিল সারাক্ষণ।"

"আপনি কুনো লোক। সারাজীবন কেবল বাবার তামাক সেজেছেন। দুনিয়ার কোন খবর রেখেছেন কি? রাখেন নি বলেই গায়ে কাদা লাগে নি। আমাকে যে কাদা-ঘাঁটার চাকরিই করতে হয়েছে সারাজীবন। তবে মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে ভাল লোকও দেখেছি। পাঁকের গল্পটা তো শুনলেন, এবার পঙ্কজিনীর গল্পটা শুনুন।"

"বলুন—।"

গল্পটি রোমঞ্চকর। ক'লকাতায় গেছি এক বিয়ের ব্যাপারে। সঙ্গে প্রায় হাজার তিনেক টাকা। গিয়ে উঠলাম এক বন্ধুর বাড়িতে।

টালিগঞ্জ ব্রীজের ওপারে তার বাড়ি। বন্ধুটির নাম দ্বিজেন পাল। পাল বলেই ডাকি তাকে। গিয়ে দেখলাম বন্ধুর স্ত্রী নেই, বাপের বাড়ি গেছেন। বড়ই বিক্ষিপ্ত-মনা তিনি। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে আমি একাই একটা ঘরে শুলাম। বন্ধু শুলেন আলাদা ঘরে। শোবার সময় চিরকাল লুঙ্গী পরে শুই। ব্যাগ থেকে একটি চেক-চেক মুসলমানী লুঙ্গী বার করে সেইটি পরে শুলাম। রাত চারটে আন্দাজ ঘুম ভেঙে গেল। শুনলাম বাইরে ভয়ানক হট্টগোল হচ্ছে। বাইরের বারান্দায় উঠে এসে দেখি রাস্তায় পিলপিল করছে লোক। মশাল জ্বলছে। লোকগুলোর মুখে মুখোশ। তাদের হাতে তলোয়ার, লাঠি আর গাড়াশা। বুঝলাম ডাকাত পড়েছে। মার মার শব্দে দরজা ভেঙে আশপাশের লোকেদের বাড়ি ঢুকে যাচ্ছে। শিশুদের চিৎকার আর মেয়েদের আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ হতে লাগল। বুঝলাম ঘরে ঘরে মৃত্যুর তাণ্ডব-লীলা শুরু হয়েছে। আমি দৌড়ে ঘরে ঢুকে বাক্স খুলে তিন হাজার টাকার নোটগুলো আমার কোটের পকেটে পুরে ফেললাম। তারপর খিল দিলাম দরজায়। বাক্সের তালাটা খুলে লাগিয়ে দিলাম দরজার কড়ায়। তারপর 'পাল' 'পাল' বলে চিৎকার করতে লাগলাম। সাড়া পেলাম না তার। শুনতে পেলাম গুণ্ডার দল মার মার শব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। আমি একটা রুলের মতো হাতের কাছে পেলাম, সেইটে নিয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগলাম যদি পালাবার কোন পথ পাই। হঠাৎ নজরে পড়ল জানলার সামনে ওপর থেকে একটা পাকানো কাপড় ঝুলছে। জানলার গরাদে ছিল না। তড়াক করে সেই কাপড় বেয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় আমার ঘরের দরজা ভেঙে গেল। চার পাঁচজন লোক এসে আমায় ধরে ফেললে, তারপর চ্যাংদোলা করে ঘরের মধ্যে এনে চিৎ করে শুইয়ে দিলে। একটা লোক আমার বুকে চেপে বসল, চারটে লোক ধরে রইল আমার হাত পা।

তারপর এগিয়ে এল একটা বিরাটকায় গুণ্ডা, তার হাতে মস্ত ছোরা। আর একটু দেরি হলে ছোরাটা বসিয়ে দিত আমার বুকে। কিন্তু বিপত্তারণ মধুসূদন রক্ষা করলেন। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল একটি স্ত্রীলোক আর উপুড় হয়ে পড়ল আমার উপর। বললে, "আগে আমায় মারো তারপর একে মেরো।" গুণ্ডাটা ওর হাত ধরে এক ঝটকায় দূরে সরিয়ে দিল ওকে। ইতিমধ্যে ঘটেছে আর এক কাণ্ড। একটা গুণ্ডা আমার কোটের পকেট থেকে নোটের তাড়া আবিষ্কার করে চিৎকার করে উঠল— টাকা, অনেক টাকা। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল আর নোটগুলো ছড়িয়ে পড়ল মেজেতে। তখন আমাকে ছেড়ে সবাই সেই নোট কুড়ুতে লাগল। তিন হাজার টাকা সব দশ টাকার নোটে ছিল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই তার উপর। সেই স্ত্রীলোকটি সুযোগ পেয়ে তখন হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে আমাকে বার করল ঘর থেকে, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে নিয়ে এল। আমার পরনে ছিল লুঙ্গী, সকলে ভাবলে আমিও মুসলমান। ডাকাতের দলটাই ছিল মুসলমানের। নিচে যারা ছিল তারা আমাকে কিছু বলল না। মেয়েটি আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির হল একটা মাঠের মাঝখানে। তার উপর দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। সেখানে আমাকে নিয়ে গিয়ে বলল, "তোমার চেহারা ঠিক আমার ভায়ের চেহারার মতো। আমার সে ভাই আর বেঁচে নেই। তুমি আমার নতুন ভাই। তোমাকে আমি মরতে দিতে পারি না। তাই নিজের জান কবুল করে তোমাকে বাঁচিয়েছি। তুমি দৌড়ে পালাও এখান থেকে।" আমি জিগোস করলাম, "তুমি কে!" সে বললে— "আমি ওই গুণ্ডাটার বউ যে তোমাকে খুন করতে যাচ্ছিল। আমি সন্ধ্যে থেকেই এই বাড়ির ছাতে লুকিয়ে বসেছিলাম, আমিই ওদের বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছি। আমি যখন তোমাকে দেখলাম তখন ওরা ঢুকে পড়েছে। তখন আমি ছাত থেকে একটা শাড়ি পাকিয়ে ঝুলিয়ে

দিয়েছিলাম, যদি পালাতে পার। কিন্তু পারলে না। যাক—এখন পালাও।"

আমি লাইন বরাবর ছুটতে ছুটতে যাদবপুর স্টেশনে এসে যখন পৌঁছলাম তখন সূর্যোদয় হয়েছে। একবার ভাবলাম থানায় খবর দি। কিন্তু তখনই মনে হ'ল তাহলে বিশ বাঁও জলে পড়ে যাব! তাছাড়া পুলিশে খবর দিলে যদি ওই গুণ্ডার বউটাও ধরা পড়ে! যে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে তাকে কি ধরিয়ে দেওয়া উচিত? সুতরাং ও আইডিয়া ছেড়ে দিলাম। গিয়ে উঠলাম আর এক বন্ধুর বাড়িতে লেকের ধারে। দিন পাঁচেক পরে খবর পেলাম পালকে ওরা কেটে ফেলেছে। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

চুপ করলেন গেরুয়াধারী।

গোবর্ধন বললেন, "আপনার একটা জীবনে এত সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে এ যেন বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে হয় না!"

"এর চেয়েও আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। আমার জীবনটি একটি আশ্চর্য ঘটনার অভিধান বিশেষ। ঠিকই বলেছেন, বিশ্বাস করা কঠিন। সেইজন্যে কারও কাছে বলিও না। আজ এই দুর্যোগের রাত্রে আপনাকে পেলাম তাই সময় কাটাবার জন্য বললাম কয়েকটা—হয়তো অবিশ্বাস্য।"

গেরুয়াধারীর কণ্ঠে একটা অভিমানের সুর যেন ধ্বনিত হল।

গোবর্ধন বললেন, 'না, না, আপনার কথা অবিশ্বাস আমি করি নি। ফার ফ্রম ইট্। আরও কি ঘটনা ঘটেছে বলুন। অদ্ভুত আনন্দ পাচ্ছি—।"

গেরুয়াধারী এক টিপ নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, "আনন্দ পাচ্ছেন এইটেই পরম লাভ। আর আমারও পরম লাভ যে আপনার মতন সহৃদয় শ্রোতা পেয়েছি একজন। অনেক ঘাটের জল খেয়েছি তো। অনেক স্রোতে ভেসেছি। তাই অভিজ্ঞতাও নানারকম হয়েছে।

শুনুন তাহলে আর একটা ঘটনা। এটাও আমার পুলিশ-জীবনেই ঘটেছিল। এ ঘটনা রূপান্তরিত করে দিয়েছিল আমার পরবর্তী জীবনকে।"

"বলুন বলুন শুনি। তামাক সাজি দাঁড়ান আর এক কলকে—"

সোৎসাহে তামাক সাজতে লাগলেন গোবর্ধন। কলকেটি ধরিয়ে, হুঁকোর মাথায় বসিয়ে একটি লম্বা টান দিলেন। প্রচুর ধোঁয়া বেরুল।

"এইবার বলুন—"

"তখন আমি রেলের পুলিশে কাজ করি। সার্জেন্ট মেজর হয়েছি। ট্রেনে গার্ডের ডিউটি। কিউলে পাঞ্জাব মেলটা এসে দাঁড়িয়েছে। কোন একটা কম্পার্টমেণ্টে উঠব বলে ছুটোছুটি করছি। হঠাৎ সামনে একটা ফার্স্ট ক্লাসের দরজা খোলা পেয়ে উঠে পড়লাম তাতে। উঠে দেখি শালপ্রাংশু মহাভুজ এক ইংরেজ ভদ্রলোক একটি বেঞ্চির এক কোণে বসে নিবিষ্ট চিত্তে বই পড়ছেন। ট্রেনটা যতক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে রইল ততক্ষণ আমি বসে রইলাম। কিন্তু ট্রেন ছাড়তেই ফুল মিলিটারি বাও করে বললাম—"একটি আইরিশের টিকিট নেবেন কি?"

সাহেব আমার হাত থেকে টিকিটের বইটি নিয়ে ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর আমার হাতে সেটা ফেরত দিয়ে বললেন, 'সরি'। শুধু 'সরি' বলেই যদি থেমে যেতেন তাহলে ওইখানেই ব্যাপার চুকে যেত। কিন্তু তিনি আমাকে ধমকে উঠলেন।

বললেন, "আপনি পুলিশের ইউনিফর্ম পরে কি করে এই টিকিট বিক্রি করছেন? এটা কি allowed? আমি আপনার নামে রিপোর্ট করব!"

আমিও দমবার ছেলে নই। বললাম, "স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। এই আমার নাম আর ঠিকানা। কিন্তু একটা কথা শুনে রাখুন—হিজ্‌ এক্‌সেলেন্সি দি গভর্নর অব বেহার একজন পাকা আই. সি. এস।

তিনি রেড ক্রশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। রেড ক্রশ সোসাইটির জন্য চাঁদা আদায় করতে তিনি ইতস্তত করেন না, কারণ রেড ক্রশ হচ্ছে আর্ত আতুরদের জন্য। স্বয়ং গভর্ণর যদি এ কাজ করতে পারেন তাহলে আমিই বা এ কাজ করতে পারব না কেন? আইরিশ্ হস্‌পিটাল্ ট্রাস্ট একটি বিশ্বব্যাপী হিউম্যানিটেরিয়েন্ অরগ্যানিজেশন্। এর জন্যে টিকিট বিক্রি করা মানে রোগীদের সাহায্য করা। আপনি রিপোর্ট করলে যদি আমার চাকুরি যায় তাহলে সেটা আমি ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করব। তখন সব সময়ই এ কাজ করতে পারব তাহলে—"

সাহেব হিপ্‌নোটাইজ্‌ডের মতো হয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। আমার নাম ঠিকানা লেখা যে কার্ডখানা তাঁর হাতে দিয়েছিলাম সেটা পকেটে পুরে ফেললেন। তারপর পকেট থেকে একটা নোটবুক বার করে একটি পাতায় গোটাকতক আঁচড় টানলেন। ঠিক যেন বক উড়ে যাচ্ছে। তারপর কাগজটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "মাই বয়, এই কাগজটা যত্ন করে রেখে দিও। ভবিষ্যতে এটা তোমার প্রভূত উপকারে আসবে।"

আমি অবাক হয়ে কাগজটা নিলাম, নিয়ে নিজের মনিব্যাগে রেখে দিলাম। সন্দেহ হতে লাগল লোকটা সম্ভবত পাগল। সাহেব কাগজটি আমার হাতে দিয়ে আবার বইয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। আমার দিকে আর ফিরেও চান নি। আমি আর একটা বেঞ্চির কোণে বসে মাঝে মাঝে তাঁর দিকে চেয়ে দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন একটা স্ট্যাচু। অনেকক্ষণ দু'জনে এক কামরায় রইলাম, কিন্তু নীরবে। উনি যদি সাহেব না হয়ে বাঙালী হতেন তা হলে পরস্পরের হাঁড়ির খবর আমরা জেনে ফেলতাম। কিন্তু তা হ'ল না, আমার প্রাণ যদিও আনচান করছিল কিন্তু সাহেবের মুখ ওলোপ দেওয়া হাড়ি! একটি

বাকা বেরুল না সেখান থেকে। অবশেষে পাটনা জংশনে এসে গাড়ি থামল। আমি আবার মিলিটারি বাও করে নেমে যাচ্ছি, সাহেব উঠে এসে আমার সঙ্গে শেক্‌হ্যাণ্ড করলেন। এমন ঝাঁকুনি দিলেন যে মনে হ'ল কব্জিটা বুঝি ভেঙে গেল। বাড়ি ফিরে গিয়ে গিন্নীকে বললাম — এটা রেখে দাও, দরকারি জিনিস। গৃহিণী মাত্রেই পুরুষকে বোকা, উড়নচণ্ডে, খামখেয়ালী—এইসব বলে মনে করেন। গিন্নী কাগজটি দেখে বললেন, কি ছবি আঁকা শিখছ নাকি? বক-ওড়ার ছবি ভালই হয়েছে। ও নিয়ে আমি কি করব, তুমি রেখে দাও তোমার চিত্রশালায়। ভালো ছবি সংগ্রহ করার বাতিক ছিল আমার, এখনও আছে। ওই কাগজের চিরকুটটা সেখানেই রেখে দিলাম একটা চামড়ার কেসের মধ্যে। এর কিছুদিন পরেই হ'ল ভূমিকম্প, ভয়াবহ ভূমিকম্প, যার কথা আপনি বলছিলেন একটু আগে। ওই ভূমিকম্পতে আপনার চাকরি গেল, কিন্তু আমার হ'ল পোয়া বারো।"

"কি রকম?"

"বলছি দাঁড়ান। এক টিপ নস্যি নি।"

তিনবার 'ওঁ তৎসৎ' উচ্চারণ করে গেরুয়াধারী নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, "ও মশায়, আলোটা একটু উসকে দিন তো। ও পাশটায় কি যেন খসখস করছে, সাপটা আবার বেরুল না কি। হ্যাঁ, ওই যে সরাতে মুখ দিয়ে দুধ কলা খাচ্ছে। আশ্চর্য কাণ্ড। কার্বলিক লোশনের তোয়াক্কাই করলে না!"

গোবর্ধন বললেন—"পীরবাবার সাপ যে। ওহো, একটা জিনিস তো বড় ভুল হয়ে গেছে—"

"কি?"

"আমাদের এঁটো খাবারগুলো পড়ে আছে। সেই কুকুরটাকে ডেকে দি। দেখি কোথায় গেল—"

গোবর্ধন বাইরে বেরিয়ে ডাকতে লাগলেন—"আঃ, আঃ তু, তু—"

তারপর ঘরে ঢুকে বললেন, "ভাগ্যে বেরিয়ে দেখলাম। আশা করে বসেছিল।"

এঁটো খাবারগুলো নিয়ে গেলেন বাইরে।

গেরুয়াধারীর মনে হ'ল এই ভাঙা ঘরে, এই সাপ, কুকুর আর ওই অচেনা লোকগুলোকে নিয়ে এই ক'ঘণ্টার মধ্যেই যেন একটা সংসার গড়ে উঠেছে। সাপটাকেও আর অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

গোবর্ধন ফিরে এসে বললেন, "আকাশে আবার বেশ তোড়জোড় শুরু হয়েছে। গঙ্গাও বাড়ছে। রাতটা পোয়ালে বাঁচি। বলুন আপনার ভূমিকম্পের কাহিনী। ভূমিকম্পে আপনার পোয়াবারো হয়ে গেল কি রকম ?"

"ব্রেট্ সাহেব যে আমার উপর প্রসন্ন ছিলেন। নানারকমে চেষ্টা করছিলেন কি করে আমাকে ওপরে তুলে দেবেন। সাহেব প্রসন্ন হলে সে যুগে পাথর-চাপা কপালেও রাজসম্মান জুটে যেত। আমি তখন জামালপুরে বদলি হয়ে এসেছি। ছেলে-মেয়েরা মজঃফরপুরে, পিসের বাড়িতে। ভয়াবহ সব খবর শুনছি আর ভগবানকে ডাকছি, ভগবান রক্ষা কর। গৃহিণীকে উপর্যুপরি দু'টা টেলিগ্রাম করেছি, কোন জবাব নেই। আমার মনের অবস্থা বুঝুন। হঠাৎ একদিন তিনি এসে হাজির হলেন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। বললেন টেলিগ্রাম পান নি। প্রচণ্ড শীত। তার পর টেলিগ্রাফের লাইন সব ঠিক হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে আমি টেলিগ্রাম পেলাম আই-জির কাছে থেকে—একজন দারোগা পাঠাচ্ছি, তাকে চার্জ দিয়ে দাও। তুমি মিস্টার ব্রেটের পার্সোনাল অ্যাসিস্টেণ্ট সিলেক্টেড্ হয়েছে। মিস্টার ব্রেট তখন রিলিফ ও রিকনস্ট্রাক্শন বিভাগের সেক্রেটারি হয়েছেন। একজন স্পেশাল

মেসেঞ্জারও এল ওই সব খবর নিয়ে। স্পেশাল ট্রেনও এল সেইদিন রাত্রে। তাতে গভর্ণর, তাঁর স্টাফ, মিস্টার ব্রেট এবং আরও সব সাহেব ছিলেন। আমার জন্যে একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরা ঠিক করা ছিল। আমি মিস্টার ব্রেটের পি. এ. হলাম। ১৯৩৪ সালটা তাঁর সঙ্গে টুর করে কাটল। অনেক টাকা কামালাম। রিকনস্ট্রাক্‌শনের অত বড় একটা রাজসূয় ব্যাপার আমার হাত দিয়েই তো হ'ল। আমার মাইনেই ছিল পাঁচশ' টাকা। ফার্স্ট ক্লাসে বরাবর গেছি। কখনও কখনও এরোপ্লেনে। ১৯৩৫ সালে রিলিফ কমিশনারের আপিস উঠে গেল। আমি আবার পুনর্মূষিক হলাম। ব্রেট সাহেব চেষ্টা করেছিলেন আমাকে ইন্‌সপেক্টার করে দিতে, কিন্তু হ'ল না। সি-আই-ডিতে বদলি হয়ে চলে গেলাম পাটনায়। ওই লাইনেই কাটল কয়েক বছর। ১৯৪৮ সালে পেন্সন পেলাম। তার পরই হ'ল ভানুমতীর খেল। ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। বিলেত থেকে হঠাৎ এক চিঠি এল। আইরিশ সুইপের আপিস থেকে। চিঠিতে লেখা—'অনেকদিন আগে একজন সাহেব তোমাকে একটুক্‌রো কাগজে কয়েকটা আঁচড় কেটে দিয়েছিলেন। তোমরা একই ট্রেনের একই কম্পার্টমেণ্টে ছিলে। সে কাগজ যদি তোমার কাছে থাকে, তাহলে সেইটে নিয়ে অবিলম্বে বিলেতে চলে এস বাই প্লেন। তোমার আসা-যাওয়া এবং লণ্ডনে থাকার খরচ আমরা দেব।' আকাশ থেকে পড়লাম! ভাগ্যে সেই কাগজটা ভাল করে রেখেছিলাম। আর কালবিলম্ব না করে বিলেত চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম ওই সাহেব ওঁদের বড় চাঁই একজন—ম্যানেজিং ডিরেক্‌টার অব্ আইরিশ সুইপ। সেই কাগজের টুক্‌রো দেখে তাঁরা আমাকে আইরিশ সুইপ্ স্টেকের ওয়ান্ অব্ দি ডিস্ট্রিবিউটার্স ইন্ ইণ্ডিয়া করে দিলেন। ফিরে এসে অনেক টাকা কামাতে লাগলাম। হাজার হাজার টাকা রোজগার করেছি এর দৌলতে। ওই অদৃশ্য হস্ত

আমার অদৃশ্য টিকি ধরে নিয়ে গিয়ে যেন লক্ষ্মীর দরবারে বসিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। কিছুদিন পরে আবার সব ধুস্। ফরেন এক্‌স্‌চেঞ্জের রেস্ট্রিক্‌শ্‌ন্ হয়ে গেছে আজকাল। আমাদের টিকিট বিক্রি একেবারে বন্ধ। এখন বিরলে বসে প্রহর গুণছি কবে আবার সুদিন আসবে, কবে আবার সূর্য উঠবে। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।"

চুপ করলেন গেরুয়াধারী।

গোবর্ধন বললেন, "সত্যি আশ্চর্য আপনার জীবন-কাহিনী। একজন লোকের জীবনে যে এত রকম বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে তা বিশ্বাসই হয় না। মনে হয় যেন বানানো গল্প---"

"একটিও মিছে কথা বলি নি। সব সত্যি --"

"ফোঁস্—"

ছ'জনেই চমকে দেখলেন সেই সাপটা ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে আর গেরুয়াধারীর দিকে ছোবল মারছে। গেরুয়াধারীর মধ্যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হ'ল সহসা। তিনি সাপটার দিকে হাতজোড় করে বলে উঠলেন, "না, সব সত্যি নয়, অনেক মিছে কথা বলেছি। নিজের বাহাদুরি দেখাবার জন্যে অনেক বাড়িয়ে বলেছি, না বললে গল্প জমে না। মাফ কর আমাকে।"

সাপটা ফণা নামিয়ে গর্তের ভিতর চলে গেল।

নির্বাক হয়ে বসে রইলেন গোবর্ধন। বাইরে শব্দ হতে লাগল--- ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্। গঙ্গার কূল ভাঙছে।

"ও মশাই, এ কি হ'ল—"

হঠাৎ সেই পাকা দেওয়ালটা ভেঙে পড়ে গেল। তারপর সেই ঘরটাও। গেরুয়াধারী ধ্বসের সঙ্গে তলিয়ে গেলেন। গোবর্ধন ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে।

পরদিন বেলা দশটা।

ভজুয়া, ভজুয়ার স্ত্রী দু'জনেই ব্যস্ত। গোবর্ধন আর গেরুয়াধারীর সর্বাঙ্গে সেঁক দিচ্ছে তারা। দু'জনেরই জ্ঞান হয়েছে। গোবর্ধন নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে লাফিয়ে পড়েছিলেন বলেই গেরুয়াধারীকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। কারণ তিনি সাঁতার জানেন না।

ভজুয়ার স্ত্রী বক্‌রির দুধ গরম করে চামচ দিয়ে খাওয়াচ্ছে দু'জনকে। ভজুয়ার কাছে মদ ছিল, সে খানিকটা মদ মিশিয়ে দিয়েছে দুধের সঙ্গে।

শরীরে একটু বল পেতেই গেরুয়াধারী উঠে বসলেন। ভজুয়ার স্ত্রীকে বললেন, "আমার থলিটা বার করে দাও তো মা—"

ভজুয়ার স্ত্রী সিন্দুক খুলে থলিটা বার করে নিয়ে এল। গেরুয়াধারী তখন তার থেকে একটা চিঠি বার করে গোবর্ধনকে বললেন, "পীরবাবা সত্যিই জাগ্রত দেবতা। তিনি আপনার কথা শুনেছেন। নিন—"

"কি ওটা?"

"সৌদামিনী দেবীর স্বামীকে অ্যারেস্ট করবার ওয়ারেন্ট। আমি আত্মগোপন করবার জন্যে আপনাকে অনেক কথা বানিয়ে বানিয়ে বলেছিলাম। কিন্তু আসলে আমি একজন সি. আই. ডি. অফিসার। সৌদামিনীর স্বামীটা দুর্ধর্ষ ডাকাত। অনেক খুন করেছে। একে যে ধরে দিতে পারবে গভর্ণমেণ্ট তাকে পাঁচ হাজার টাকা বকশিশ দেবেন ঘোষণা করেছেন। আপনি সেই বকশিশটা নিন। কি করে তাকে ধরতে হবে তার লুলুক সন্ধান আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। অতি সহজে পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে যাবেন। আর বাকি পাঁচ

হাজার আমি আপনাকে নিজে দেব, কারণ আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এই দশ হাজার টাকা জমা দিয়ে আপনি কেশিয়ার হয়ে যান—”

গোবর্ধন সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, “সে কি হয়! আপনার টাকা আমি নেব কেন। বাবা আমাকে নিতেই দেবেন না—”

গেরুয়াধারী সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন গোবর্ধনের দিকে।

গোবর্ধন মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।